



# ଅମଳ ପୂର୍ବ କଥା

ଅମଳମୟୀ ଦେବୀ

ସମ୍ପାଦନା : ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ  
ଅଙ୍କ-ପରିଚିତି : ଅମଳେନ୍ଦୁ ବୋଷ



ଅମଳ ପୂର୍ବ କଥା

প্রথম প্রকাশ : ১৯১৭

দাম ১২ টাকা

প্রচ্ছদগট । বিবল মজুমদার

প্রকাশক : ইন্ডিয়া মজুমদার  
অবধারনা, ৭০ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা ৬  
মুদ্রাকর : আশীষ চৌধুরী  
অরুণা গ্রেস, ১৬ হেন্সেল সেন স্ট্রিট, কলকাতা ৬

## উৎসর্গ ।

মা, তুমিই জীবন্ত “পূর্ব কথা”, তবুও আবার আমি তাহা কাগজ কালি  
কলমে লিখিয়া তোমার শ্রীচরণে উৎসর্গ করিয়' প্রথম সার্থক জ্ঞান  
করিলাম ।

‘ভার্য্যবাস’  
২য় ভাষ্যসারী, }  
১২১৭ ।

প্রণত কৃত্ত।  
প্রসন্নময়ী ।









প্রসন্নময়ী দেবী



জননী জন্মভূমি স্বর্গাদপি পরায়সী।

আমাদের গ্রামের আদি নাম কি তাহা জানি না ও একশে জানিবারও কোন উপায় নাই। স্নেহময়ী মাতৃরূপিণী পিতৃষমাগণ এখন লোকান্তরে, কুলপুরোহিত চক্রবর্তী মহাশয়দিগেরও বংশলোপ হইয়াছে। শিবরাত্রির সলিতার মত যে ছ'-একজন আছেন, তাঁহারা ইংরাজীনবিগ, হুতরাং অতীতকথা অতীত, স্বতির সহায়ে বাহা মনের মধ্যে তোলপাড় করে তাহাই লিখিতেছি।

আমার পূর্বপুরুষ শাক্ত, পূজা হোম বলি তাঁহাদের নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার ছিল। “হরি মৈত্র ও মৈত্রের পুত্র বাদবানন্দ চৌধুরী” \* চৈতন্যদেবের ধর্ম সঙ্কীর্ণনে মুগ্ধ হইয়া হঠাৎ তাঁহাদের শিষ্যত্ব গ্রহণ পূর্বক গ্রামের নাম “হরিপুর” রাখিয়াছিলেন। আমার পিতৃগৃহ এখনও সেই স্বতিময় হরিপুরেই। তাহার পূর্বের সব ভগ্নাবশেষ এযুগেও আমাদের নিকট তেমন মর্ম্মস্পর্শী ও মৃগপ্রদ।

হরিপুরের মত সুন্দর পল্লীগ্রাম এ জীবনে আর কখনো দেখি নাই—আমিও পূর্ববঙ্গ ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের অনেক স্থান দেখিয়াছি, কিন্তু এমন “শস্য-শ্রামলা” এমন দীর্ঘ ঘন পরিপুষ্ট পুরাতন বৃক্ষশ্রেণী, এমন নিবিড় বনরাজি শুকপ্রায় “কদমতলী” এমন “বিল কুড়ুলে” এবং সর্বাপেক্ষা সুন্দর কাচবৎ স্বচ্ছ “বড়াল” নদী এ জীবনে কখনো ভুলিতে পারিব না।

“নানান্ দেশের নানান্ ভাষা,  
বিনে স্বদেশীয় ভাষা, পুরে কি আশা ?  
কত নদী সরোবর, ধারাজল বিনে কত  
মিটে কি চাতকের তৃষা ?”

সাতশ বর চৌধুরী এবং দুশ আড়াইশ বর কুটুম যে গ্রামের শোভা ছিল, কলরবে বেহান মুখরিত থাকিত, এখন সেখানে পোড়োবাড়ী, জুহলে ভিটে ব্যতীত শতাধিকও জনপদ নাই। তবুও তাহার পূর্বস্বতি ও সৌন্দর্য মনকে পরিতৃপ্ত ও দ্রবীভূত করে। প্রবাসের রত্নালয় অপেক্ষা নিজের দেশের স্মৃশান ভাল। সেখানে কত স্নেহের কত প্রাণের কত আশার জিনিস ভ্রমসাৎ হইয়া গিয়াছে, তথাপি সে পুণ্যক্ষেত্র দর্শনে মনপ্রাণ জুড়াইয়া যায় ও শান্তির পথে অগ্রসর হয়। বর্তমানের এ শোকসন্তপ্ত জীবন যদি আবার সেই বাল্য স্মৃথের পল্লী জীবনের সহিত বিনিময় করিতে পারিতাম, তাহা হইলে আর একদিনও এ সভ্যতা বিড়ম্বিত মহানগরীতে থাকিতাম না। আবার সেই সোনার গাঁয়ে চলিয়া বাইরা স্নেহের স্বতির মধ্যে বাকী অংশটা কাটাইয়া দিতাম।

\* বাদবানন্দ চৌধুরী সাধারণের নিকট “বাহু কীর্জনে” নামে আজিও পরিচিত।

পূর্বে ইংরাজী পড়া চলিত ছিল না। পার্শী, সংস্কৃত ও বাংলা পড়া গ্রাম্য পাঠশালায় হইত। আমরা গ্রামের বড় ভরক, পিতামহদেব বংশের বড়ছেলে, সেইজন্য প্রত্যহ আমাদের তরফেই নৈশ বিদ্যালয় বসিত। মিত্রা নাহেব তাহার শিক্ষকতা করিতেন। শুনিয়াছি রাজি এগারটা পর্য্যন্ত, জ্যেষ্ঠতাভ, খুলতাভ, পিতৃদেব ও অজ্ঞাত আত্মীয়গণ সকলে মিলিয়া সম্মুখে “আলব, বে, তে, সে” পড়িতেন। এখন যেমন ইংরাজী কবিতা মুখস্থ করা নিয়ম, তখন তেমান পার্শী বয়দ, হাফিজ, সাদি কণ্ঠস্থ করান হইত। পাঁচ বৎসরে বালকের হাতে খড়ি ও সেই হইতে প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় কুলপুরোহিত “নামস্নোক” অর্থাৎ শিত্তমাতৃ-কুলের ষাশ পুরুষের নাম শিক্ষা দিতেন এবং চাণক্য পণ্ডিতের হিতোপদেশ মুখে মুখে পড়াইতেন। আর ভূগোল স্বরূপ প্রথমে গ্রামের পার্শ্ববর্তী গ্রামের নাম, জিলা, পরগণা, তাহার লোকসংখ্যা, জাতি, গোজ, গাঁই ও বিবাহস্থজে কে কাহার কুটুম্ব শিখান হইত। তাহার পর মহকুমা ও আদালতের কাছারী যেখানে রাজস্ব জমা দিতে হইবে তাহাও বলিয়া দিতেন। যে বালক এইসকল বিষয়ে শীঘ্র দক্ষ হইয়া উঠিত, তাহাকে কাছারী বাড়ীতে প্রত্যহ প্রাতে তালপত্রে লেখা শেখান হইত।

আমার পিতৃদেব ৬তুর্গাদাস চৌধুরী। তাহার জন্মস্থান নাটোরের রাজবাড়ী। মহারাণী কুম্ভমণি দেবী\* এবং আমার পিতামহী দুই সহোদরা ভগ্নী। নাটোরের অনতিদূরে ইসলামগাঁতি গ্রামের রায় মহাশয়েরা অতি প্রতাপশালী হৃদ্যন্ত জমীদার ছিলেন। শুনিয়াছি, রাম রায়, কজ রায়ের ভয়ে বাঘে গরুতে একঘাটে জল খাইত। তাহাদিগেরই ঘরের এই দুইকন্ঠা। মহারাজা রায় বিশ্বনাথ বাহাদুর দুইজনকেই বিবাহযোগ্য রূপে মনোনীত করেন। আমার পিতামহী কুমারী দেবী জ্যেষ্ঠা ও দয়াময়ী দেবী কনিষ্ঠা। দুইজনই অপূর্ব সুন্দরী। তবুও দুই ভগিনীর মধ্যে একটু বর্ণের তারতম্য ছিল, কুমারী দেবীর বর্ণ তপ্তকাক্ষনভ ছিল না, একটু শ্রামাভাস্কৃত ও ওষ্ঠাধরে একটা ক্ষুদ্র তিল থাকায় নিখুঁত রূপবতী দয়াময়ীকেই মহারাজা বাহাদুর বিবাহ করিলেন। আর কুমারী দেবী আমাদিগের গরীব ব্রাহ্মণের গৃহ আলো করিয়া ধনে, পুত্রে, স্বামীশ্রেমে লক্ষ্মীশ্বরী হইলেন।

আমরা কাপ ও মৈত্র, নবাব-প্রদত্ত উপাধি চতুর্ধুরীণ ও বহু বংশপরম্পরায় ঐ খেতাব চলিয়া আসিয়াছে, তাহাই এক্ষণে সংক্ষিপ্ত আকারে চৌধুরী পদবীতে পরিণত হইয়াছে।

রাজসাহী জেলার হরিপুর, কাশিমপুর ও নালোর এই তিন গ্রামের কাপ কুলীনের সম্বন্ধ কিম্বা পদগৌরবে কুলীন অপেক্ষা উচ্চ। কত কুলীনের কুলভঙ্গ

\* মহারাণী কুম্ভমণির পিতৃদত্ত নাম দয়াময়ী, মহারাজা বিশ্বনাথ বাহাদুর বৈকুণ্ঠধরবল্লভী থাকায় বিবাহ পরে, বালিকা পত্নীকে বৈকুণ্ঠধর্মে দীক্ষিতা করিয়া কুম্ভমণি নামকরণ করিয়াছিলেন।

করিয়া কন্তাগণের বিবাহ দিয়া অনেকেরই নিঃশ্বাস হইয়া গিয়াছেন তথাপি “কুলকার্য্য” ছাড়েন নাই। এইক্ষণেও সামাজিক লৌকিকতায় ও ভোজন দক্ষিণায় নিরাবিল কুলীনের সমান মর্য্যাদা পাইয়া থাকেন। আমাদের আসমুদ্র বারেন্দ্রসমাজ, কোথায় কাশী, আর কোথায় বিক্রমপুর, মৈমনসিং, রাজসাহী। বারেন্দ্র ব্রাহ্মণে ভরপুর, তবুও সে সমাজে কুলীন পাঁজ পাওয়া বড় কঠিন ছিল, তাহাতেই জমিদারী লিখিয়া দিয়া, বহু অর্থ ব্যয়ে কুলীনে কন্তাদান করিতে হইত। আমার পূর্ব পুরুষরাও এই কুলীনে কন্তাদান করিতে প্রায় সর্বস্বাস্ত হন। আমার পিতামহ ৮কালীকান্ত চৌধুরী মহাশয়ের প্রথমা কন্তা ৮করণাময়ী দেবী; তাহার পর প্রথম পুত্র ৮কালীকিশোর চৌধুরী\* (রামকৃষ্ণ অন্নপ্রাশনের নামে) ও দ্বিতীয় পুত্র গৌরমোহন এবং ক্রমে চারি কন্তা ও সর্ব কনিষ্ঠ দুর্গাদাস। পূর্বকালে তীর্থযাত্রা এক মহা সমস্তার ব্যাপার ছিল, ঠাকুর দাদা ৮কালীকান্ত চৌধুরী উইল করিয়া পূর্ব পুরুষের গুপ্ত ধন মুক্তিকাতলু হইতে উঠাইয়া সপরিবারে নোকাযোগে কাশী দর্শনে যান ও সেখানে দৈব ছক্সিপাক বশতঃ চৌদ্দ বৎসরের পুত্র গৌরমোহনের অকস্মাৎ মৃত্যু হওয়াতে অতীব শোকাবুল অবস্থায় সেখান হইতেই দেশে ফিরিয়া আইসেন। তখন মহারানী কৃষ্ণমণি দেবী, জ্যেষ্ঠার এই পুত্র শোকের সান্ধনা দিবার জন্য নাটোর রাজধানীতে তাঁহাকে আনাইয়া অতি যত্ন আদর করেন এবং সেখানেই আমার পিতৃদেবের জন্ম হয়। পূর্বকালে পুরাতন ঘরের এবং রাজবাড়ীর প্রাথাসারে পিতৃদেবের জন্মের পূর্বে বালুঘটিকা সম্বন্ধে আচার্য্য ও গণ্যকারগণ গণনায় দেখিয়াছিলেন যে, যে সন্তান জন্মিবে সে অতি ভাগ্যবন্ত হইবে। মাতার প্রসব বেদনার কথা শুনিয়া আমার পিতৃষাগণ, নিজেদের মধ্যে বলাবলি করিয়াছিলেন “আম্র ভাই আমরা এখন লুকাইয়া শয়ন ঘরে বাইয়া ঘুমের ভাণ করিয়া পড়িয়া থাকি, এখনি মায়ের একটা মেয়ে হইবে আর ঠাকুরানী মাসীমা (মহারানী কৃষ্ণমণি) ও মাসীমারা সব কাঁদাকাটি করিবেন।” এমন সময় আমার পিতৃদেব শুভক্ষণে শুভলগ্নে ভূমিষ্ঠ হইলেন ও শব্দ রবে এবং হলুধ্বনিতে রাজপ্রাসাদ মুখরিত হইয়া উঠিল। তাঁহার মাতুলানীরা এত বাড়াবাড়িরূপে হিন্দুয়ানীর আচার বিচার মানিয়া চলিতেন যে শূত্রের ছায়া মাড়াইবার ভয়ে, প্রাক্ষণে বাহির হইবার পূর্বে ব্রাহ্মণ পরিচারিকা দ্বারা শূত্রদিগকে সরাইয়া দিতেন। তাঁহারাই ভাগিনেয়ের জন্ম শুনিয়া, একেবারে স্তম্ভিত হইয়া চুপিয়া পড়িলেন। লোণার কুরে শিশুর নাড়ী কাটাইয়া মহারানীর আদেশানুসারে “সর্বমঙ্গলা দেবীর” বাড়ীর প্রাক্ষণে তাহা পুতিয়া রাখা হইল। “সর্বমঙ্গলার” কৃপায় পুত্রশোকের শাস্তিস্বরূপ এই শিশুর জন্ম মনে করিয়া অন্নপ্রাশনের সময় তাহার নাম দুর্গাদাস রাখা তখনি স্থির হইয়া গেল।

\* জ্যঠা মহাশয়ের রাশি নাম কালীকিশোর, আবহ নাম রামকৃষ্ণ চৌধুরী মহারাজা রামকৃষ্ণ রায় বাহাদুরের নাম বলিয়া নাটোরে ঐ নামে পরিচিত ছিলেন।

পিতৃদেবের এগার মাস বয়সেই পিতৃবিয়োগ হয়। পিতামহ দেবের আটত্রিশ উনচত্রিশ বৎসর বয়সে এই অকাল মৃত্যুতে রাজসাহী জেলার চতুর্দিকে হাহাকার পড়িয়া যায়। তিনি অসাধারণ সুন্দর, ধার্মিক ও আদর্শপনায়ক জমীদার ছিলেন। তাঁহার পিতৃমাতৃভক্তি, আত্মীয়স্বজনের প্রতি স্নেহ ও নিঃস্বার্থ প্রজ্ঞাপালনের কথা আজিও শুনিতে পাওয়া যায়। তাঁহার মৃত্যুশোকে আত্মীয় বন্ধু চাকর দাসী ও প্রজাগণের মনে এত আঘাত লাগিয়াছিল যে দেশের লোকে বলিতে লাগিলেন—  
“এমন একটা ইজ্ঞপাত হইয়া গেল; এমন দিক্‌পাল স্বামীর মৃত্যু হইল, কিন্তু সাধী রামকৃষ্ণের মায়ের কান্নার শব্দ কেহ শুনিল না। এমন সংঘম, এমন ধৈর্য্যশীলা সতীলক্ষ্মী এ অঞ্চলে নাই।”

পিতামহ দেবের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সংসারে যেন অলক্ষ্যী প্রবেশ করিল। আজ এটা বিজী, কাল ওটা বন্ধক, এইরূপে দারুণ ঋণজালে জড়িত হইয়া, কতক জমিদারী রক্ষার্থে পিতৃদেবের খুল্লতাত ৮কমলাকান্ত চৌধুরী ছোট-কর্তা, তাঁহার ভগিনীপতি লাহিড়ী মহাশয়ের নামে সম্পত্তি সব বেনামী করিয়াছিলেন। লাহিড়ী মহাশয়ের সম্বন্ধে ছুচারি কথা এখানে বলিব। পূর্বে লাহিড়ী মহাশয় সাত কাহন কড়িতে গৌমস্তাগিরি কাজ করিতেন। কোলীন্ড মর্যাদাবশতঃ আগে পিতৃদেবের শিসিমাতার সহিত বিবাহ হয়, ও তাঁহার মৃত্যুর পরে আবার বৃদ্ধ বয়সে, আমার পিতৃমহা ৮মুখরী দেবীকে বিবাহ করেন। উপযুক্ত ঘর না পাওয়ায় পিতামহী দেবী বাধ্য হইয়া এই কার্য্য করিয়াছিলেন। শিসিমাতাকে বিবাহ করিবার পর মোস্তারী করিয়া তিনি ক্রমে ধনবান হইতে লাগিলেন ও আমাদিগের সম্পত্তির অর্দ্ধেক তাঁহার হস্তগত হওয়ায় তিনি তখন রাজসাহী জেলার মধ্যে একজন মাতব্বর ব্যক্তি হইয়া উঠিলেন। স্বর্ধ্যাস্ত আইনের কল্যাণে কত রাজা মহারাজা রায় বাহাদুর তাঁহার ঋণজালে জড়ীভূত হইয়া পাঁচহাজারের স্থানে দশ হাজার দিয়া জমিদারী রক্ষা করিতেন এবং তাহাতেই তিনি ঐশ্বর্য্য-শালী হইয়া আমাদিগের সুবর্ণ অঙ্গদের ভ্রায়, “সোনাবাজু পরগণা” কান্ধেমী বন্দোবস্ত চেষ্টায় আত্মবিশ্বস্ত হইলেন। পিতৃদেব ক্ষুদ্র বালক, জ্যেষ্ঠতাত সৌখীন বাবু। সে কালের দৃষ্ট্রে মাথায় বাবরি চুল, দস্তে মিশি, বিশ টাকার ধুতির পাড় ছিঁড়িয়া পরেন, (পাড়ে তাঁহার অঙ্গে ব্যথা লাগিত!) শুস্তরে খোদিত শ্রামসুন্দর মুক্তি, উদার প্রকৃতি, যাহা কিছু পাইতেন, পরহৃৎখে কাতর হইয়া চক্ষের জল সহ দিয়া দিতেন। বিষয় কর্য্যে কখনো মনোনিবেশ করিতেন না। পিতামহী দেবী তাঁহাকে এজন্ত ভৎসনা করিলে বলিতেন, “দয় ফুরাইলে কৈ কাহার? সর্ব্বস্ব তুকে লউক, তাহাতে আমার এ স্বভাব আর বাইবে না। ইজ্ঞত যায় ধুলে আর স্বভাব যায় ম’লে।” এত যে সংসার অচল তথাপি রাজসাহীতে থাকিয়া ওস্তাদের নিকট সঙ্গীত চর্চা করিতেন। তাঁহার বয়স্ক প্রিয় পিতৃব্য বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে এইরূপ চিঠি লিখিয়াছিলেন—“সেতার বাজালে



কিছু হয় না, জমিদারী নিলাম হয়ে যায়, বাবু সেতার বাজায় সেতার বাজালে কিছু হয় না। অরাভাবে কাঁদে মা, তেল পান না পিসি, বাবুরি নেড়ে চলছেন, বাবু, দৃষ্টে দিয়ে মিশি।” এই কবিতাপত্রে জ্যেষ্ঠতাত গৃহে কিরিয়্যা আসিলেন বটে, কিন্তু বিষয়ের কোন বন্দোবস্ত হইল না। গৃহদেবতা শ্রামরায় ঠাকুরের বাড়ীতে তেমনি নৈশ মজলিস বসিতে লাগিল, এবং অক্ষকীড়া, গান বাজ পূর্ববৎ সমারোহে চলিল,—এই সব দেখিয়া শুনিয়া ভগ্ন হৃদয় ছোট কর্তা সম্পত্তির শোকে গঙ্গা লাভ করিলেন।

আমাদের বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের কন্তাগণ বড় সুন্দরী, অসাধারণ বুদ্ধিমতী ও ততোধিক তেজস্বিনী। বাল্যকালে কোন অবাধ্যতা করিলে জ্যেষ্ঠমাতা রাগিয়া বলিতেন, “কাপের মেয়ে সাপও খায় না, এমি তেজ।” সকলেই অল্প বিস্তর ধনবানের কন্তা, কুলীন পাত্রে পরিণীতা হইয়া আশৈশব পিতৃগৃহবাসিনী, শশুরালয়ের মুখ কখনও দেখিতেন না। কাজেই ভগ্ন কাহাকে বলে তাঁহারা জানিতেনও না।

বিশেষতঃ আমার পিতৃষসাদিগের রূপগুণে বারেন্দ্র সমাজ আলোকিত ছিল। কোনও ধনবানের গৃহদেবতা প্রস্তুত করিবার সময় তাঁহাদিগকে দেখিয়া ঠাকুরাণীজি তৈয়ার করিবার জন্য ভাস্করকে আমাদিগেরি গৃহে পাঠান হইত—এ জনশ্রুতি এখনও সে অঞ্চলে প্রচলিত।

একে পিসে মহাশয় বুদ্ধ, তাহাতে পিসিমাতা অপূর্ব সুন্দরী ও দ্বিতীয় পক্ষের পত্নী। “বুদ্ধস্ত তরুণী ভার্য্যার” প্রভাবে বেনামীর সমস্ত কাগজ পত্র অঘাটিতে তাঁহাকে দিয়াছিলেন। তাঁহার বাক্য লাহিড়ী মহাশয়ের নিকট বেধ পুরাণের মত ছিল। পিতৃদেব দ্বাদশ বর্ষ বয়সে মাতৃহীন হইয়া লাহিড়ী মহাশয়ের গৃহে ভগিনীর নিকট থাকিয়া রাজসাহী কলেজে ভর্তি হইয়াছিলেন, এবং তাহার পূর্বে পাশী, উর্দু এবং বাংলা পড়িয়াছিলেন। আমাদের বংশে কেহ কখনও ইংরাজী পড়েন নাই ও সরকারী চাকুরী করেন নাই। পিতৃদেবই প্রথমে ইংরাজী অধ্যয়ন করিয়া সেকালের ইংরাজীনিবিশ ও সরকারী চাকুরী গ্রহণে বৈবাহিকগণের নিকটে “হলধর” উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কৃষকেরা যেমন প্রাতে “বাসিপান্ডা” বাহাই পায় খাইয়া লাঙল কাঁধে মাঠে যায়, তিনিও তেমনি অর্দ্ধ ভোজনে নির্দিষ্ট সময়ে হংসপুচ্ছ চালনা করিতে কাছারী যাইতেন, তাই “হলধর” পদ লাভ করিয়াছিলেন।

সতের আঠার বৎসর বয়সে পিতৃদেব জুনিয়ার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১১ টাকা বৃত্তিসহ টাকা কলেজে পড়িবার অহুমতি পাইয়াছিলেন কিন্তু আমার তৃতীয় পিতৃষস ৬ মুণ্ডারী দেবী সর্বকনিষ্ঠ পুত্রোদিক প্রিয়তর ভ্রাতাকে নির্বাক্তব হানে পাঠাইতে কিছুতেই সন্মত হইলেন না। ৬ কুঞ্জলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (ভূতপূর্ব কলিকাতার ছোট আদালতের জজ) তখন রাজসাহী কলেজের হেড মাষ্টার ছিলেন, ও পিতাকে অতিশয় স্নেহ করিতেন, তিনি মধ্যস্থ হইয়া কলিকাতা

হিন্দুকালেজে পাঠের বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। বৃত্তিটি বন্ধ হইয়া গেল। সে সময়ে আমাদিগের সাংসারিক অবস্থা অতীব শোচনীয়। লাহিড়ী মহাশয়ের মাস-হারায় সকলের দিনপাত হইত; পিতৃদেবের কলিকাতায় পাঠের খরচ কিরূপে চলিবে ভাবিয়া বাড়ীতে সকলে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইলেন। আগেই বলিয়াছি, বারেন্স ব্রাহ্মণের কন্ঠাগণ অতীব ভেজস্বিনী, ইহাতে পিসিমা ৮ মুখ্যী দেবী বড় উদ্বেজিত হইয়া স্বামীকে বাইয়া বলিলেন “আমার পৈতৃক সম্পত্তি চোখে ধূলি দিয়া অমনি বেনামিতে ভোগ করিতেছ, আর আমার ভাইয়ের খরচাভাবে লেখাপড়া বন্ধ হইবে—এ কিরূপে তায় বিচার? যদি আমার ভাইয়ের পাঠের ব্যয়ভার তুমি বহন না কর, আমার সমস্ত স্ত্রীধন ও অলঙ্কার তাহাকে লেখা পড়া করিহা দিব, তাহাতে তুমি কোন বিষয় ঘটাইতে পারিবে না। নিশ্চয় জানিও এ অন্তায় আমি কিছুতেই সহ্য করিব না।” পিসে মহাশয় বড় গোল ও বেগতিক দেখিয়া পিতৃদেবের কলিকাতার মাসিক খরচ দিতে অগত্যা স্বীকার হইলেন।

তখন পিতাঠাকুরের কলিকাতা বাইবার আয়োজন হইতে লাগিল। কুটুম্ব কৃষ্ণনাথ সার্যাল ও অবৈতনিক বিশ্বস্ত ভৃত্য বংশপরম্পরায় চাকরাণে প্রতিপালিত কিশোর দাসের সঙ্গে যাওয়া স্থির হইল।

তখনকার দিনে রাজসাহী হইতে নৌকা যোগে কলিকাতা গমনাগমন যে কত বিপদসঙ্কুল তাহা এদিনে বুঝান বড় শক্ত। পথে পথে পথে লুটেরা ডাকাত, রাহাগির ও ঠগী জীবন হাতে করিয়া পথ চলিতে হইত। পিতৃদেব যখন যাওয়া আটসা করিতেন, পানসীর মাঝি মাল্লারা সম্মুখে চিড়ে গুড় ও পিষ্টল কলসীতে জল লইয়া দিবারাত্রি অবিশ্রান্ত নৌকা বাহিয়া বাইত এবং ক্ষুধা পাইলে ঐ সব খাইত মাত্র। আর ভৃত্য কিশোর বন্দুকে গুলি পুরিয়া বসিয়া পাহারা দিত।

পিতৃদেব যৎকালে প্রবাস যাত্রা করিলেন তখন বাড়ীতে কান্নার রোল পড়িয়া গেল। স্নেহময়ী পিসিমারা ভ্রাতার নিরাপদে পৌছার সংবাদ না পাওয়া পর্যন্ত শয্যাশায়ী হইয়া রহিলেন। তারের সমাচার সে সময়ে প্রচলিত ছিল না, ডাকের চিঠিই সপ্তাহে একদিন মাত্র আসিত। পত্র আসিবার দিন তাঁহারা প্রত্যুষ হইতে “ভূগানাম জপ” করিতেন, দৈবাৎ যদি কোনবার পত্রের গোল হইয়া বাইত তাঁহারা একেবারে অন্নভল ত্যাগ করিয়া সর্বদা রোদন করিতেন। একমনে নারায়ণের মন্তকে লক্ষ তুলসীপত্র দিয়া সহোদরের মঙ্গল প্রার্থনায় শান্তি অন্ত্রয়নে নিরত থাকিতেন। পিতৃদেব জেলেপাড়া ভবানীপুরে বাসবাড়ী স্থির করিয়া হিন্দুকলেজে ভর্তি হইলেন। প্রত্যহ পদব্রজে কলিকাতা কলেজে পড়িতে গাইতেন। গ্রীষ্মের প্রচণ্ড রৌদ্র ও আষাঢ়ের বৃষ্টি মন্তকের উপর দিয়া অবাধে চলিয়া বাইত, তাহাতে শরীর ও মনে কোন ক্লেশ বোধ করিতেন না। ট্রামগাড়ী সে সময়ে ছিল না এবং অশ্বখানের অর্থাভাব সূতরাং এ কষ্ট তাঁহার অনিবার্য। চিরসম্পদের কোড়ে লালিত পালিত বলিয়া লক্ষ্মীর কৃপায় দারিদ্র্য দুঃখ কাহাকে বলে

জানিতেন না। প্রতিদিন আহারান্তে পাঁচ ছয় ক্রোশ পথ হাঁটিয়া যাওয়া তাঁহার কখন অভ্যাস থাকে। দূরে থাকুক কল্লনাও করেন নাই। অবস্থার পরিবর্তন সহ বাহ্য করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন সে অশ্রু একাদিনের নিমিত্ত পশ্চাৎপদ। কিম্বা দুঃখিত হন নাই। অক্লান্তভাবে দৈনিক পড়াশুনায় নিযুক্ত ছিলেন।

পূর্বের বেতন ভোগী ব্রাহ্মণের হস্তের রন্ধন খাইলেও “জাতে পতিত” হইতে হইত সে কারণ প্রতি ধনীর গৃহেও গৃহিণীর রন্ধন প্রথা ছিল, বিদেশে তাহা আর কি প্রকারে হইবে? বেদিন সন্ন্যাস কাকার অস্থখ করিত সেদিন পিতৃ-ঠাকুরকে স্বহস্তে রন্ধন করিয়া খাইয়া কলেজে বাইতে হইত। তাঁহাকে রন্ধন করিতে দেখিয়া পার্থের ছাত্রাবাসের ছাত্রগণ কোতুকচ্ছলে ডাকিয়া বলিত “বলি ও ছোট বৌ, তোর রান্না কেন এগোয় না, এত দেরি, তুই বড় অকর্ম্মা।”

অমাত্যবিক শৈর্য এবং চরিত্রবলে সমস্ত বাধা বিয় অতিক্রম করিয়া নিয়ম মত মা সরস্বতীর সেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়া দিয়াছিলেন। ক্ষুরধার বুদ্ধি ও অসাধারণ অধ্যবসায় গুণে আশাতীত উন্নতি লাভ করিয়া কলেজের শিক্ষকগণের প্রিয়পাত্র ও সহপাঠীদিগের প্রীতিভাজন হইয়া উঠিয়াছিলেন। কাপ্তান রিচার্ডসনের শিষ্যবর্গ সকলেই সেক্ষপিয়ারে পারদর্শী এবং তাঁহার কবিতা কণ্ঠস্থ করিতেন ও মধ্যে মধ্যে কলেজের ছাত্র সভায় তাহার অভিনয় হইত। তৎকালে “প্রবোধচন্দ্রোদয়” বাঙ্গালা পাঠ্যপুস্তক ছিল। একালের জ্ঞান সর্ব্ব বিষয় পাসের নিয়ম ছিল না। যে কয়েকটি বিষয়ে উত্তীর্ণ হইতেন তাহাতেই পাস হইয়া উপাধি পাইতেন। তিনিও গণিত ভিন্ন অন্য সব বিষয় পাস করিয়া “সিনিয়ার” নাম পান।

বৎসরান্তে পূজার ছুটিতে পিতৃঠাকুর যখন বাড়ী বাইতেন তখনকার সে বিপদের কথা এক একটা কাহিনীর মত। চারি পাঁচবার ডাকাইতের হাতে পড়িয়া প্রভুভক্ত ভৃত্য কিশোরের সাহায্যে বাঁচিয়া যান। একবার শিবনিবাসের চূর্নানদীতীরে আহারাঙ্গির নিমিত্ত নৌকা লাগাইয়া রন্ধনের ব্যবস্থা করেন এমন সময় ভদ্রলোকের আরোহী নৌকা দেখিয়া ঘাটের লোকেরা বড় চাঞ্চল্য প্রকাশ করিতে থাকে। নদীয়ার গড়োগোয়ালারা সব ডাকাত এবং জমীদারের জ্ঞাত-সারেই এ কার্য্য করিত। ডাকাতেরা দিনে গৃহস্থ ব্যক্তির মত নদীতীরে বসিয়া থাকিত, বন্দুত বলিয়া কেহ বুঝিতে পারিত না। পিতার পান্‌সী নৌকাতে নানা প্রকার দ্রব্যাদি দেখিয়া ডাকাতেরা নৌকায় আগুন লইতে আসিতে লাগিল, ঐ একটা সঙ্কেত, —ও ক্রমে একে একে দুচার জন নৌকায় আসিয়া তাঁহার আসবাব সকল দেখিয়া বাইতে ছিল। তখনি স্থচতুর কিশোরদাসের বন্দুকে গুলিগোরা হইল ও সে অতি সঙ্গর্পণে কাণ্ডখানা কি, কেন এত লোক লম্বাগম্ব তাহা দেখিবার জন্ত তীরে নামিয়া গেল। নামিয়া ঘাটের অস্থখ গাছের তলায় কালীবাড়ী পৌছিয়া বাহ্য দেখিল, তাহাতে একেবারে অজ্ঞান হইয়া

বাইবার কথা। কিন্তু অসীম সাহসী কিশোর বিনুস্বামী ভীত না হইয়া অতীব ভয়ঙ্কর কাণ্ড সব দেখিতে লাগিল। কালীর বাড়ী একটু নির্জন স্থানে ও শ্মশান প্রাঙ্গণে অবস্থিত এবং সেই গৃহের অভ্যন্তরে ভয়ানক মূর্তি কালীমাতা দণ্ডায়মান। তাঁহার সর্বদা সিঁদুর ও বলির রক্তে রঞ্জিত, লোল জিহ্বা শোণিত পিপাসায় লক্ষ লক্ষ করিতেছে, বয়ে বন্দুক তলোয়ার লাঠি সোটা, বর্শা, বল্লম খড়্গ ঢাল টাঙ্গী এবং অসংখ্য নির্দোষ মশাল ও এক-কোণে প্রকাণ্ড এক প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ড। মূর্তিমান বমরুণী ডাকাতেয়া সব কাল রঙে দেহ রঞ্জিত করিয়া এবং মুখে সিঁদুর লেপিয়া এক বীভৎস মূর্তি ধারণ করিতেছিল। হায়! প্রায় শতাধিক লোক এই কার্যে ব্যাপৃত। রাজে নোকা লুট করিয়া যে সকল মূল্যবান দ্রব্য পাইবে, এবং বাবুকে কালীর চরণে বলি দিবে, তাহার কোতুকাবেহ আলোচনায় অটুহাস্ত করিতেছে। এই ভয়াবহ দৃশ্যে কিশোরদাস হতবুদ্ধি হইয়া উর্জ্বাসে পালাইয়া নোকার বাইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বলিতে লাগিল, — “ছোট বাবু আর রক্ষা নাই, জীবন্ত বয় সব সম্মুখে, আর খাওয়া দাওয়া না, নোকা ছাড়িয়া দিবার হুকুম দিন। এবার আপনাকে বাঁচাইতে পারিলাম না। ডাকাডাকা, এখনি মারিয়া ফেলিবে।” ইহা শুনিয়া সাম্রাট কাকা কম্পবান্ কলেবর ও পিতৃদেব নির্দোষ। তখনকার কালে ঐ সব নদীতে জোয়ার ভাটা খেলিত। তখন ভাটার সময়, সম্মুখে অন্ধকার রাত্রি বন্দুকের গুলি ফুরাইয়া গিয়াছে। উপায়স্বর বিহীন অবস্থায় রক্তনের আয়োজন চড়ায় অমনি ফেলিয়া মৃত্যু নিশ্চিত ভাবিয়া নির্ভীক পিতাঠাকুর স্থির চিত্তে পান্‌সীর বাহিরে আসিয়া ঠাড়াইয়া রহিলেন।

অন্ত আরো মহাজনী নোকার বহর সেখানে ছিল; তাহারা বড় ভীত হইয়া পড়িল। কিন্তু সেই সব নোকার মাঝি মাল্লারা আহারের দ্রব্যাদি অমনি পড়িয়া রহিল দেখিয়া পিতাকে বলিতে লাগিল “ভয় কি কর্তা, আমরা সব পূর্ববন্ধের লাঠিয়াল, এমন লাঠি চালাইব যে দলকে দল জখম হইয়া হটিয়া বাইবে। আমরা-দের লাঠির এক বা সজ্জ করে এমন কেহ নাই। সেবা করুন (খান) এখনও সময় আছে, আমরা দোয়ায় কোন হানি হইবে না।” নোকার ডহরে ৬।৭০ খানা লাঠি লুকাইয়া ছিল, দেখাইয়া আশা দিতে লাগিল। অল্পজল তবুও কাহারো মুখে উঠিল না। তাঁহারা সমস্ত কণ জোয়ারের প্রত্যাশায় নদীর দিকে তাকাইয়া প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। ক্রমে সূর্য্যদেব ডুবিয়া বাইবার উপক্রম হইলে অন্ত নোকার লোকেরা বিপদ বুঝিয়া ইহাদের ভাব গতক দেখিতে লাগিল। অত্যন্ত ব্যগ্রতা বশতঃ বান ডাকিবার আগেই পিতৃদেব নোকা খুলিয়া দিবার আজ্ঞা দিলেন। ভগবানের অনন্ত অসীম কৃপায় যেমন পান্‌সীর দড়ি মুক্ত হইল অমনি প্রবলবেগে জোয়ার আসিয়া পান্‌সীকে জোরে ভাসাইয়া মাঝ গাড়ে লইয়া ফেলিল। আর পশ্চাৎ হইতে মহাজনী নোকার বহর কিছু না বুঝিয়াই ছুটিয়া আসিতে লাগিল। নদীতে মহা কোলাহল পড়িয়া গেল। শিকার অসময়ে হাত-

ছাড়া হইয়া পালাইতেছে দেখিয়া ডাকাতেরা দলে দলে “রি, রি” \* “জয় মা কালী, জয় মা কালী” রবে দ্বিগুণল কাঁপাইয়া উঠেঃখরে গালি দিতে দিতে ঘাটে আসিয়া পড়িল ও নৌকা ধরিবার জন্য ভিজীতে চড়িয়া পক্ষাৎ পক্ষাৎ বাইতে লাগিল ; সেই মাঝি মাল্লার লাঠি ও কিশোরের কাঁকা বন্দুকের আওয়াজে ডাকাতেরা ভয় মনোরথ হইয়া কিরিয়া গেল।

শিবনিবাসের ঐ স্থান আগে ডাকাতের আড্ডা ও সংহারকালীর পীঠস্থান ছিল। পূজার সময় এখানে বহুবিধ নৌকা মারা বাইত ও নরহত্যা হইত। ইংরাজ রাজত্বের সূশাসনে সে সকল উৎপাত আর নাই। নদীয়া জেলার চুয়াডাঙ্গা মহকুমার নিকটে একটা স্থানে এক ভাই অজ্ঞাতে আর এক ভাইকে হত্যা করিয়া নৌকা লুণ্ঠিয়া তাহার বখাসকর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়াছিল। সেই হইতে সেই স্থানের ছোট শাখানদীর নাম “ভাইমারার খাল” হইয়াছে। পিতৃঠাকুর স্বধন চুয়াডাঙ্গা সবডিভিসনের কার্যে ছিলেন, তখন আমাদিগকে এই সকল ডাকাইতের পুরাতন আড্ডা দেখাইয়াছিলেন। নরবলির হাড়-কাঠের চিহ্ন একণেও নাকি নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্যভাবে আছে, এইরূপ জনরব।

রাজশাহীর কোন এক গ্রামে “গামছা মোড়ার দল” ছিল। তাহার দ্বিনেই ভদ্রলোক পথিক দেখিলে গলায় গামছা মোড়া দিয়া তাহাদিগকে মারিয়া বাহা কিছু পাইত লইয়া পলাইয়া বাইত। ক্রমশঃ তাহাদিগের অত্যাচারে লোকজনের পথে বাহির হওয়া মহা অনিষ্টজনক ও ভয়াবহ হইয়া উঠায় রাজপুরুষেরা ছদ্মবেশে গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করিয়া রাখালবালকগণের সাহায্যে শেষে দলপতিকে ধৃত করিয়া তাহাকে দলসহ দীপান্তরিত করেন। সেই হইতে “গামছা মোড়ার দল” দেশ হইতে অন্তর্হিত।

এদেশে বাল্যবিবাহ প্রচলিত থাকায় সাধারণতঃ ধনী সন্তানগণের অতি অল্প বয়সে বিবাহ হইয়া থাকে কিন্তু পিতৃদেব আশৈশব এ প্রথার বিরোধী ও তিনি গুরুজনের ইচ্ছার বিরুদ্ধে স্বীয় মত বজায় রাখিয়া তাঁহাদের অপ্রিয় হইয়াছিলেন। কত ধনবানের সুন্দরী কন্তার সহিত তাঁহার বিবাহ সম্বন্ধ আসিত। জ্যাঠামহাশয় অতীব ব্যস্ত হইয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতার বিবাহ স্থির করিতে চাহিতেন, পিতৃঠাকুর অমত প্রকাশ করায় নিরাশ হইয়া বাইতেন। জমিদারী পর হস্তগত, উপার্জন কিছু নাই, লাহিড়ী মহাশয়ের মাসহারা সম্বল, এ অবস্থায় বিবাহ করা অস্বচিত মনে করিয়া সে প্রসঙ্গ কাহাকেও তুলিতে দিতেন না। সকলের কথা ত্রৈলিতে পারিতেন, পিসিমাভাদিগের কথার অবাধ্য হওয়া তাঁহার পক্ষে অসম্ভব ছিল। তাঁহার পিতাকে এই প্রতিজ্ঞা করাইয়াছিলেন যে কেবল কোন সম্ভ্রান্ত ঘরের বোগ্য পাত্রী পাইলে তাঁহারাই বিবাহ স্থির করিবেন এবং পূর্বের পত্র দ্বারা তাঁহাকে জানাইবেন। তাঁহাকে বিবাহের উপযুক্ত পাত্রী মনে হইলে তিনি সে

ভাগ্যে থাকে বিষয় বিভব আবার হইবে। গুণবান্ সর্ব্বাংশে, এ অঞ্চলে এরূপ কার্য্য ত পূর্ব্বে কখন হয় নাই। এ কালের তায় দেনা পাণ্ডার হৃদীর্ঘ কন্দ, টাকার হাঁক ডাক, অলঙ্কারের তালিকা, কিছুই হইল না। কেবল ৫১টা টাকা মাত্র “পণ” পাত্র মর্য্যাদায় শুভ পরিণয় স্থির ও সুসম্পন্ন হইয়া গেল।

কোন কোন স্থলকণা কন্টার পিতৃগৃহ ত্যাগের পরে তাহাদের পরিবারে নানা রকম আপদ বিপদ দেখা দেয়। আমার মায়ের শ্বশুরালয়ে গমনের পর রায় মহাশয়দিগেরও গৃহে সেই প্রকার বিবিধ দুর্ঘটনা ঘটিতে লাগিল। তাঁহাদিগের গোষ্ঠীপতি ফকীরচাঁদ রায় ১০৫ বৎসর জীবিত ছিলেন, তিনি পলাসীর যুদ্ধের সময় পাঁচ ছয় বৎসরের বালক। রণবাত্তের গল্প, সৈনিকের গল্প পার, ইত্যাদির বিষয় শীতের সন্ধ্যাকালে অগ্নিকুণ্ডের পার্শ্বে বসিয়া বালক বালিকাগণের নিকট বলিতেন। তিনি রায় পরিবারের ধৃতরাষ্ট্র, জন্মান্তর, জ্বরনীতিজ্ঞ নহেন, অন্ধ এবং পরিণামদর্শী বৃদ্ধ। মাহুকের এক ইন্দ্রিয় বিকল হইলে অন্তর্গত শক্তি যেমন বাড়িয়া যায়, তাঁহারও তেমনি দৃষ্টির অভাবে শ্রবণ শক্তি অতীব প্রখর ছিল। পদ শব্দে লোক চিনিতেন। “ঠগীর হাকাম ও গামছা মোড়ার” অভ্যাসের নিবারণ করিতে রায় বৃদ্ধের উপর সরকারী পরোয়ানা আইসে ও তিনি তাহাদিগকে ধৃত করিবার জন্য গ্রামে গ্রামে গোয়েন্দা নিযুক্ত করেন। সেই রাগে একদিন রাজি দ্বিপ্রহরে “গামছা মোড়া” স্বদলে রায় মহাশয়ের বাড়ী আসিয়া আক্রমণ করে। সিপাই শাস্ত্রী ঘোড়সোয়ার এবং মশালের আলোকে চারিদিকে একটা হৈঃ চৈঃ পড়িয়া যায়। তখন অন্ধ রায়পতি শয়ন ঘর হইতে কাণ্ডখানা কি ভয়ঙ্কর বৃষ্টিতে পারিয়া সেকালের ক্রীতদাসী অতি বিখাসী রাসমণিকে ডাকিয়া গোপনে কি পবামর্শ দিয়া, অন্তর মহলের সমস্ত দুয়ার খুলিয়া দিতে আজ্ঞা দেন ও শয্যায় বসিয়া স্থিরচিত্তে “হুর্গানাম” জপে মনোনিবেশ করেন। মুক্তদ্বার পাইয়া দলের লোকের একেবারে অন্তরে প্রবেশ করিয়া দেখিতে পাইল যে, অতি ছোট ছোট ছেলে মেয়ে এবং প্রবীণারা কেবল অন্তঃপুরে রহিয়াছেন ও রাসমণি প্রভৃতি ক্রীতদাসীরা একত্র মিলিয়া ইষ্টক, হাড়ি ও প্রস্তর খণ্ড ফেলিয়া মারিতেছে। পিতৃমাতৃ উচ্চারণে কুৎসিত গালি অপমান সূচক বাক্য স্ত্রী কন্টার নামে স্থগিত কথা বলিতেছে। রজনী প্রভাতোন্মুখ, “কাড়িতে” অবশ্য সংবাদ পাঠান হইয়াছে, অচিরাত্ ধৃত হইবার ভয়ে ডাকাতেও পলায়ন করিল। এদিকে বহুতর চৌকিদার সম্ভিষ্যাহারে দারোগা, বক্সি আসিয়া বাড়ী ঘিরিয়া কেলিল। সে রাজা “গামছা মোড়া” রায় মহাশয়ের পরমাত্মন্দরী কিশোরী বিধবা পুত্রবধূকে অপহরণ করিয়া তাঁহাদের চির অকলঙ্ক পবিত্র কূলে কালী দিতে আসিয়াছিল। তীক্ষ্ণবুদ্ধি দূরদর্শী অন্ধরাজ তাহা বুঝিতে পারিয়া বালিকা বধূকে মলিন বস্ত্রে দাসীকন্তা সাজাইয়া কলসী কক্ষে খিড়কীর পথে জ্বলে পাঠাইয়া নিরাপদ করিতে রাসমণিকে পূর্ব্বেই পরামর্শ দিয়াছিলেন। ফকিরচাঁদ রায় মহাশয়ের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সেই বৎসর

মধ্যে রায়বংশ প্রায় লোপ হইয়া গেল। এই অভাবনীয় ঘটনায় ভাটরা এবং রাখাল বালকে ছড়া বাধিয়া ঘাটে মাঠে গ্রামে গ্রামে গাহিয়া বেড়াইত, আর তাঁহার প্রভাগণ গুনিয়া হাহাকার করিত।

“ককিরচাঁদ রায় বুকে  
বমের দুয়ার জুড়ে  
আছিল পড়ে একশ পাঁচ,  
তাঁহারি পুণ্যের জোরে,  
বাধা ছিল এক ডোরে,  
ছিড়িল বন্ধন সব বাজে যমালয়।”

ককিরচাঁদ রায় মহাশয়ের সময় বাঙ্গালার দুর্ভিক্ষ ছিল না। ক্ষেত্রে অপরিমিত ধান, মৃগ, মসুর, খেসারি, ছোলা, মটর ও সরিষা জন্মিত। গোয়াল পাড়ীতে ভরা; দুগ্ধ, ঘৃত, ক্ষীর, ছানা বাড়ীতে হইত। পুষ্করিণী মৎস্তে পূর্ণ, বাগানে ফল তরকারী অপরিাপ্ত, চাকরাণ দত্ত জোলাতে কাপড় যোগাইত, অতিথি অভ্যাগতে গৃহ চির মুখরিত ছিল। বাড়ীর পাঠশালার বৃদ্ধ বসিয়া তত্ত্বাবধান করিতেন ও বালক বালিকাগণ রীতিমত সেখানেই অধ্যয়ন করিত। সন্ধ্যা সময় ‘হরিসকীর্তন, রামায়ণ, মহাভারতের কথা’ ও কখন কখন আরব্য পারস্ত উপস্তাস বলা হইত। স্বস্থ সবল স্বন্দর বালক এবং ততোধিক স্বন্দরী বালিকায় রায়বংশ সমৃদ্ধ ছিল। সত্য সত্যই রায় বুকের লোকান্তর গমনের সঙ্গে সঙ্গে বাগের পরিবার সব ছারখার হইয়া গেল।

“এক লক্ষ পুত্র আর সওয়া লক্ষ নাতি,  
কেহ না রহিল হার! বংশে দিলে বাতি।”

অন্নপূর্ণারূপিনী বালিকা বধু আমার মাতৃদেবীর স্তন আগমনে আশ্রয়লাভের বড় তরফের বেন শ্রী কিরিয়া গেল ও সহসা কমলার রূপা দৃষ্টিপাতে চারিদিকে নাঃসারিক উন্নতির লক্ষণ দেখা দিল। তাহাতে পরিজনদের বিশেষতঃ পিসিমাতা-গণের নব বধুর প্রতি স্নেহপূর্ণ দৃষ্টি পড়িল ও তাঁহারই “পরে” এইরূপ হইল মনে করিয়া তাঁহাকে সকলেই কতাবৎ স্নেহ করিতে লাগিলেন। সেই নবমবয়সী ক্ষুদ্র বালিকা শৈশবের খেলা-ধুলা তুলিয়া পর সেবায় আত্মোৎসর্গ করিয়া জননীরূপে চৌধুরী গৃহ সমৃদ্ধ করিলেন। কত যুগ যুগান্তর বহিয়া গিয়াছে সেই বালিকা এক্ষণে অতি বৃদ্ধা, ধন-সম্পদ, পুত্র-পৌত্রের পরিবেষ্টিতা; তথাপি পর দুঃখ ভ্রবণে অল্প বিসর্জন করিয়া আত্মপূরণ নির্বিকারে সকলকে স্নেহ দান করেন। মাতৃচাকুরী শ্রীমতী ময়মরী দেবী অত্যন্ত দেশভক্ত। তাঁহার স্বদেশোৎসাহ অতুলনীয়, ভারত-কর্মের বালুকণা তাঁহার চক্ষে স্বর্ণরেণু। প্রত্যহ প্রাতে শয্যা ত্যাগের পর পূজা সমাপ্ত করিয়া সকলের জন্য “আশীর্বাদী পুষ্প নামাইয়া” তবে জল গ্রহণ করিয়া থাকেন। তিনি লোক দেখাইবার জন্য বাগবজ্র ব্রতচার করেন নাই।

তাঁহার পার্থিব দেবতা স্বামী; সেই স্বামী-আজ্ঞা চিরকাল শিরোধার্য্য করিয়া জীবনের সমুদায় এক আদর্শে গড়িয়া তুলিয়াছেন ও চরিত্রের অঙ্করণে স্বীয় সন্তানগণকেও শিকা দিয়াছেন। পিতৃ মাতৃ আদর্শের চরিত্রগুণে যাহার সন্তানগণ শিক্ষা পায় তাহারাই স্বার্থ মনুষ্যত্ব লাভ করে।

কলেজে ত্যাগের পর পিতৃদেব পাটের ব্যবসা করিতে উদ্যোগী হইলেন। সঞ্চয় কিছু নাই অথচ ব্যবসা বাণিজ্য বাতুমন্ত্রে কখনও হয় না; ইহা বহু ব্যয়সাধ্য ব্যাপার কাজেই তিনি উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। তাঁহাকে বিপর দেখিয়া ভ্রাতৃ-বৎসল পিসিমাতা ৮মুখরী দেবী স্বইচ্ছায় সেই বেনামী সম্পত্তির “দলিল দস্তাবেজ” সব ক্ষেত্র দিতে ব্যগ্র হইয়া ভ্রাতাকে আদালতের আশ্রয় লইতে বারম্বার বলিতে লাগিলেন। জ্যেষ্ঠতাত প্রভৃতি ইহা যুক্তিসঙ্গত মনে করিয়া আইন ব্যবসায়ীদের নিকটে গোপনে যাওয়া আসা ও পরামর্শ সংগ্রহ করিয়া কাগজ পত্র লইবার জন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। এই সকল বিষয়ে পিতামাকুর সম্পূর্ণ উদাসীন ভাবে রহিয়া কাণ্ডখানা কি দেখিতেছিলেন। এটি অল্পচিত্ত মনে করিয়া অতি ধীর ও গভীরভাবে একদিন পিতৃঘসা মাকুরাণীকে নিভৃত্তে ডাকিয়া কাগজ পত্র ফিরাইয়া দিতে যাওয়ার জন্ত অসঙ্কটে মুখে বলিলেন, “আপনার স্বামী বিবাস ও স্নেহ বশতঃ ঐ সব আপনাকে রাখিতে দিয়াছেন। আপনি তাঁহা অজ্ঞাতে আমাদিগকে সেই সকল ফিরাইয়া দিয়া লোকতঃ ধন্বতঃ নিন্দনীয় হইবেন। স্বামী ঙ্গলোকের সর্ববন্ধ, ইহলোক পরলোকের একমাত্র সার, গতি মুক্তি। ভ্রাতা ত ভ্রাতা, আপনার ইষ্টমন্ত্র-দাতা গুরুদেব স্বয়ং আসিয়া চাহিলেও দিবেন না। আপনার এ ব্যবহারে আমি বড় মর্খাহত হইয়াছি।” পুরাতনিক স্নেহাস্পদ কনিষ্ঠের এই নিঃস্বার্থ বাক্য শুনিয়া তিনি লজ্জায় কাদিয়া ফেলিলেন। কথাটা যতই গোপনীয় হউক না, লোক পরস্পরায় অচিরাতঃ তাহা পিসে মহাশয়ের কর্ণগোচর হইল। তিনি তাহাতে কোন চাকল্য না দেখাইয়া নিঃসন্তান প্রযুক্ত নিজের ভ্রাতৃপুত্রকেই পোস্তপুত্ররূপে গ্রহণ করিলেন। চিরন্তন প্রধামুসারে পোস্ত যেরূপ হইয়া থাকে এক্ষেত্রেও তাহাই ঘটিল। অলস বিলাসী ভোগস্থখরত ও মোসাহেব দলে বেষ্টিত মূর্খ পোস্তপুত্র পিসিমাতার অব্যাহত হইয়া উঠিয়া তাঁহাকে উদ্বেজিত করিতে লাগিল। বিশেষতঃ আমাদের পরিবারের প্রতি অত্যন্ত ঈর্ষান্বিত থাকার আরো অনর্থ ঘটাইবার চেষ্টায় নানাপ্রকার অত্যাধিকার্য্যে অগ্রসর হইতে লাগিল। পিসিমাতা মনচুখে কেবলই বলিতেন—

“যি দিয়া ভাজ নিমের পাত,

নিম না ছাড়ে আপন জাত।”

পোস্তপুত্র নীলকণ্ঠের বিষের স্রাব তাঁহার কণ্ঠে রহিয়া গেল। তাহাকে লইবার পরই একজিশের অধিক বয়সে পিসিমার একটি যুত পুত্র জন্মিয়াছিল এবং তাহার জন্মের পূর্বে পিসে মহাশয় ভাবী স্বধের আশায় পিসিমাতার নামে ত্রিশ চল্লিশ



হাজার টাকা আয়ের জমিদারী “স্বীধন” দান বিক্রয়ের ক্ষমতা সহ লিখিয়া দিয়াছেন। তাহাতে হতক্ষেপ করিতে পোস্তপুত্রের কি আর কাহারো কোন অধিকার রহিল না, পিসিমাতাই সর্বের সর্বী হইয়া নিজের “স্বীধনের” ভোগ দখল ও কর্তৃত্ব করিতে “স্বত্ববতী” রহিয়া গেলেন।

কাল পূর্ণ না হইতেই কত জন অকালে চলিয়া যায়, আর সময়ে ডাক আসিলে ত সকলেরই বাইতে হয়। একে পিসে মহাশয়ের পারের কাড়ি ঢের, তাহাতে বৈতরণীর তপ্ত বালুকার উপর পা পড়িয়াছে আর গৃহে ফিরিবার উপায় নাই, বাইতে হইবেই এবং তিনিও তাহা মনে মনে বুনিয়া গদ্যবাহার আয়োজন করিতে আজ্ঞা দিলেন। রাজসাহীতে খুব ভোলপাড় পড়িয়া গেল। মৃত্যুকাল সরিকট, কিন্তু জান টন্টনে, ভুল-ভ্রান্তি কিছু যাত্র নাই, “বিনা যুদ্ধে এক সূচ্যগ্র ভূমি ছাড়িয়া দিবেন না” শেষ পর্য্যন্ত সেই একই প্রতিজ্ঞা। তবু পিতৃদেব যে দলিল-পত্র হাতে পাইয়াও লন নাই, সে কথাটা শেষকালে তাঁহার মনকে দ্রবীভূত করিয়াছিল। তিনি সহরের প্রধান প্রধান লোকজন ডাকাইয়া আমাদিগের বহুপুরুষাত্মগত সেই বেনামীর অর্ধেক সম্পত্তি ফেরত দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া পিতৃদেবের নামে লেখা পড়ার আদেশ দিলেন। নিঃস্বার্থ ধর্ম-পরায়ণ পিতৃদেব তাহাতে অসম্মতি জানাইয়া দৃঢ়ভাবে সর্বসম্মুখে বলিলেন, “আমি একা বিষয় গ্রহণ করিব না, আমার দাদা, আমার পিতৃব্যপুত্রগণকে বঞ্চিত করিয়া আমি সম্পত্তি ভোগ করিব ? ইহা কখনই সম্ভব হইতে পারে না, দিতে হয়ত চারি জনকে সমান অংশে লিখিয়া দিন, নতুবা আমি চাই না। সামান্য ধনসম্পত্তির জন্য ধর্মপথ ছাড়িতে পারিব না। আমাদের পৈতৃক বিষয় আইন-সম্মত আমাদের প্রাপ্য। আপনি বহুকাল ভোগ করিয়াছেন, এক্ষণে সময়কাল উপস্থিত, সব ছাড়িয়া দিয়া শান্তিলাভ করুন।” উদার-হৃদয় জ্যাঠামহাশয় সমবেত সভার মধ্যে দাঁড়াইয়া বলিলেন, “আমার অংশ ছোট ভাইকে দিলেই আমি খুসি, আমার কোন আপত্তি নাই, তবে কাকার ছেলেদের প্রাপ্যটা দিতে হইবে।”

এই প্রকারে লেখা পড়ার একটা গোল পড়িয়া গেল। বাবা জ্যাঠামহাশয়কে সকলে একবাক্যে ধস্ত ধস্ত করিতে লাগিলেন। মৃত্যুকালে কঠিনহৃদয় বৈবরিক ব্যক্তিরও মন হয়ত কতক দ্রবীভূত হইয়া থাকে, কিম্বা ভ্রাম্যসম্মত প্রাপ্য বলিয়াই হউক, কতকটা বিষয় চারি অংশে সমান ভাগে লেখাপড়া হইয়া গেল এবং পিতা-ঠাকুরের ধর্মপরায়ণতার জন্য পিসেমহাশয় মৃত্যুকালে অল্প উপযাচক হইয়া সন্তুষ্ট-চিত্তে একটা ক্ষুদ্র সম্পত্তি তাঁহাকে পৃথক লিখিয়া দিলেন। সেটা তাঁহার সত্যতার পুরস্কার। পিতৃদেব তাহারও অর্ধেক আবার জ্যাঠামহাশয়কে দিয়াছেন! তাঁহাদের স্নেহ-নিদর্শনস্বরূপ তাহা এক্ষণে আমার।

গদ্যবাক্তিত দেশ বলিয়া আমাদের আত্মীয় কুটুম্বগণ সেকালে থকা লাভাভে

মুরশিদাবাদ বাইতেন। এখনকার জায় নৈহাটী কি কলিকাতা গমনাগমনের এমন সহজসাধ্য পথ তখন ছিল না। মৃত্যুজ্ঞ জ্ঞাত বাত্মা বতই কেন সমারোহে হউক না তাহার ভিতর যে গভীর শোকচ্ছায়া লুকাইত থাকে তাহাতে কেবলই করুণ ক্রন্দনধ্বনি চারিদিক আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। অনেক লোকজন বন্ধু-বান্ধব সহকারে নৌবাসোণে পিসেমহাশয় জাহ্নবী-বাত্রা করিয়া শেষে মুরশিদাবাদে ভাগীরথী-গর্ভে অস্ত্রিয়ে শান্তিলাভ করিলেন। হিন্দু রমণীর বৈধব্য জীবনের বিষয় বলিবার কিছু নাই; তাহা সকলেই অবগত আছেন। বিশেষতঃ আমাদের বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের ঘরের পঞ্চম কন্যা বালিকা হইতে অশীতিবর্ষীয়া বৃদ্ধার সেই একই নিয়ম। পিসিমাতা পতি বিয়োগে শোককাতরহৃদয়ে সেই জনাকীর্ণ গৃহে শূন্যভাবে প্রত্যাগ- হইয়া হাহাকার রবে শয্যাশায়িনী হইয়া রহিলেন।

“নাট্যশালা সম সে হৃন্দরী পুরীর” আলোক সব নির্কাপিত হইয়া গেল। অতিথি অভ্যাগতের সমাধর রহিল না। পোস্তপুত্র সহচর লইয়া সেখানেই বিরাজিত থাকিয়া দুর্জীব্যবহারে পিসিমাতার স্বাস্থ্য এবং শান্তি আরো ভঙ্গ করিয়া দিল। তিনি সেই যে শয্যা আশ্রয় করিলেন তাহা হইতে আর আরোগ্য হইয়া উঠিলেন না। পিতৃদেবকে স্বীয় সন্তানাদিক ভাল বাসিতেন। তিনি তৎকালে তাঁহাকে ছাড়িয়া প্রবাসে বাইতেও পারিলেন না। ব্যবসা বাণিজ্যের সব লোকসান হইয়া তাঁহাকে বিব্রত করিয়া ফেলিল। মাতৃসমা পিসিমাতা দিব্য চক্ষে দেখিতে পাইলেন যে, তাঁহার মৃত্যুর পর পিতৃ পরিবারের কি শোচনীয় সাংসারিক অবস্থা ঘটিবে ও তাহার প্রতীকার করা তাঁহাদিগের পক্ষে সাধ্যাতীত। রোগ-শয্যায় পড়িয়া পড়িয়া তিনি কেবল ভ্রাতার পরিণাম চিন্তায় অধিকতর কাতর হইয়া পরলোকের পথে দ্রুত অগ্রসর হইতে লাগিলেন। সেই সময় তাঁহার স্বামীদত্ত সেই অমঙ্গলজনক জীধন ভ্রাতার ভবিষ্যতের উপকারার্থে আইনজ লোক দ্বারা সমস্ত রীতিমতন লিখিয়া দিলেন। তাঁহার সেই কল্যাণ কামনার দানপত্র শনিগ্রহরূপে আমার পিতৃ-গৃহে প্রবেশ করিয়া ভাবী সর্বনাশের সূত্রপাত করিল।

সিপাহী বিপ্লবের প্রজ্বলিত অগ্নিশিখায় যখন সমগ্র দেশ ভস্মীভূত হইবার উপক্রম, চারিদিক বিপদাচ্ছন্ন, সেই সময় আমাদের পরিবারের সকলে পিসিমাতাকে লইয়া মুরশিদাবাদে রওনা হইয়া গেলেন। ভরা ভাদ্রমাস, জলপথেও বিদ্রোহী সিপাইগণের অমাত্মক অত্যাচার, কোনরূপে জীবন লইয়া তাঁহারা বধ্যস্থানে পৌঁছিয়া নবাবসরকারে সাহায্য প্রার্থনা করিয়া পাঠাইলেন। বিদ্রোহী সিপাইগণ তাঁহাদিগের নৌকা লুণ্ঠ করিবার জন্ত পশ্চাৎ পশ্চাৎ অগ্রসর করিয়া ছিল। পিতৃদেবকে তাহারই পূর্বে নবাব-বাড়ী হইতে “রায় রাইয়া” পদে নিযুক্ত করিতে এক আহ্বান-পত্র আসিয়াছিল। যদিও তিনি তাহা গ্রহণ করেন নাই তবু সমযোচিত সাহায্য দানে তাঁহারা পরাভূত হইলেন না এবং কণ্ঠস্থগত

পরিচয়ের সম্মানটা রক্ষা করা হইল। এক সময়ে আমাদের পূর্ব পুরুষ ৮নয়ন-কৃষ্ণ চৌধুরী নবাব সরকারে উচ্চ পদারূঢ় ছিলেন।

মুরশিদাবাদের গঙ্গাভীরে গঙ্গাধর কবিরাজ মহাশয় সেকালে বাস করিতেন। তিনি বিদ্যা বুদ্ধি এবং আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসায় অসাধারণ ব্যক্তি ছিলেন। তিনিই গঙ্গাধার্য্য করিয়া বাইতেন তিনিই একবার তাঁহার নিকট শেষ দিনটা জানিয়া লইতেন। অর্থলালসা তাঁহার ছিল না, উচিত প্রাপ্য মাত্র গ্রহণ করিতেন। তিনি অনেক অস্তিম রোগীকেও বাঁচাইতেন, আবার সামান্ত পীড়ার চিকিৎসায় ভার গ্রহণে পশ্চাৎপদ হইতেন। এমন নাড়ীজ্ঞান ছিল যে, যুত্বার ঠিক সময়, দিন, বলিয়া গঙ্গাভীর করিয়া দিতেন। আমার পিসিমাতাকে এক মাস “য়েদাদ” দিয়া নিত্যই অমনি অমনি দেখিতে আসিতেন। রোগীর অসামান্য গুণ, হুশিকা, যাক্ষিত বুদ্ধি, জ্ঞান এবং সদালাপে বুদ্ধ কবিরাজ পিতৃবৎ স্বত্ব সহকারে পুরাতন শাস্ত্র-তত্ত্ব-কথা তাঁহাকে শুনাইতেন, ইহলোক ও পরলোকের উচ্চতর বিষয় সকল বলিয়া তাঁহার মনকে একেবারে নিলিষ্ট করিয়া তুলিতেন। কবিরাজ এদিকে আবার বড় কোতুকপ্রিয় ও কোপন-স্বভাব বিশিষ্ট ছিলেন। এক সময়ে কোনো এক বিধবা জমিদারনী অনেক অর্থলোভ দেখাইয়া তাঁহার নিকট চিকিৎসার্থে গিয়াছিল। ঔষধ ইত্যাদি দিয়া তিনি যখন পথ্যের ব্যবস্থা করিলেন তখন সমস্ত লোকের মুখ লজ্জার অবনত হইয়া গেল। ভিষকপ্রবর উচ্চহাস্ত করিয়া বলিয়া উঠিলেন, “ঠিক পথ্যের ব্যবস্থা দিয়াছি কোনো ভুল হয় নাই, এ রোগীর এই ঔষধ-পথ্য, বেনী টাকার লোভ দেখাইয়া অজ্ঞরূপ ব্যবস্থা আমার কাছে দেবতাও কখন পাননা জানিবেন।” প্রাপ্য টাকা মাত্র গ্রহণ করিয়া পারিতোষিক অবজ্ঞাসহ ক্ষেত দিয়া চলিয়া গেলেন। তিনি ধনগন্ধিত ব্যক্তির প্রতি অভিশয় তুচ্ছ তাচ্ছিল্য ভাব দেখাইতেন ও তাঁহাকে যে অর্থ-লোভ দেখান হয় সেটি অপমান-সূচক ব্যবহার মনে করিয়া তাহার প্রতিশোধ এই প্রকার স্পষ্ট কথায় লইয়াছিলেন। যে কালের কথা বলিতেছি, সে সময় মুরশিদাবাদে আরো একজন খুব দক্ষ, উদারচরিত্র ইংরাজী শিক্ষিত ডাক্তার—বাদবচ্চর ধর ছিলেন। তাঁহার খ্যাতি ও-অঞ্চলে সর্বত্র পরিব্যাপ্ত ছিল। চিকিৎসার সুনামের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার বহুবিধ অস্ত্র সব গুণে তিনি লোকরঞ্জক হওয়ায় বিদেশী রোগী সর্বত্রই তাঁহারই শরণাপন্ন হইতেন। আমার পিতৃদেবের সহিত তাঁহার বিশেষরূপ আলাপ পরিচয় হইয়া যাওয়াতে প্রত্যহ তাঁহারা যাওয়া আসা করিতেন এবং নানা রূপ কথা-বার্তা ও জাতীয় উন্নতিকর কার্যের আলোচনা হইত; ব্রী-শিক্ষা তাহার মধ্যে একটি প্রধান। ডাক্তার ধর নারী জাতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়া তাঁহাদিগকে ব্রীতিমত লেখা পড়া শিক্ষা দিবার নূতন নূতন উপায় ভাবিয়া স্থির করিতেন এবং গৃহে-গৃহে চিকিৎসার্থে বাইয়া তাহা প্রচার করিতেন। তাঁহার মত কেহ মনোযোগ সহ শুনিতেন, কেহ বা উদ্ভাঙ্গের প্রলাপবাক্যবৎ মনে করিয়া

হাসিতেন। পিতৃদেব ও আমাদিগের পরিজনগণের গঙ্গাবাসে থাকাকালীন, ধর মহাশয়ের হঠাৎ পত্নী বিয়োগ হয়। তিনি তাঁহার স্ত্রীর অকাল মৃত্যুজনিত শোকে কাজ কর্ম ত্যাগ করিয়া একেবারে শয্যা আশ্রয় করেন। তাঁহার কাকা এই সংবাদে অত্যন্ত কুপিত হইয়া ভ্রাতৃশুভ্রকে ভৎসনা করিয়া বলেন, “বাদব, তোমার এ কি শোক? স্ত্রী এক জোড়া চটি জুতা বই ত না। এক জোড়া গিয়াছে আর এক জোড়া তার চেয়েও ভাল আনিয়া দিব। কান্নাকাটি কি? ভাগ্যবানের বউ মরে, তাহা পিতলে ধর ভরে।” পিতৃব্যের এই সাহসবাক্যে বাদববাবুর শোকের কোন প্রতীকার ত হইল না এবং স্ত্রীর উপর ঐ প্রকার অশ্রদ্ধা এবং অসম্মানে আরো মর্মান্বত হইয়া ক্রমে সংযতচিত্তে কর্তব্য পালনই করিতে লাগিলেন। সেই যৌবনে পত্নীর মৃত্যুর পরে প্রৌঢ় কাল পর্যন্ত তাঁহাকে স্মরণ করিয়া আর বিবাহ করেন নাই; জীবনের শেষ পর্যন্ত বিপত্নীক ছিলেন। “চটি জুতা” যে ছিঁড়িয়া গেল তাহা পুনর্বার কিনিয়া গৃহে আনিতে পিতা মাতা কি কাকা কেহই পারিলেন না। সে কালের লোকের এক একজনের এমনই মানসিক ভেজ ও ধর্মজ্ঞান ছিল যে, তাঁহাদের চরিত্র-বলের কথা আজও কাহিনীর ন্যায় সকলে শুনিয়া থাকেন। এই কবিরাজ ও এই ডাক্তার সর্বাংশে অতুলনীয় চরিত্রবান, সঙ্গাশয় মহাত্মা ব্যক্তি ছিলেন বলিয়া তাঁহাদের বিষয় আমরা শুনিয়াছি, আবার আমাদের পরবর্ত্তিগণও শুনিতেছেন।

কবিরাজ-দত্ত কাল পূর্ণ হইবার পূর্বেই পিসিমাতার দিন ফুরাইয়া গেল; তিনি অকালে দিব্যধামে চলিয়া গেলেন। তাঁহার চল্লিশ পূর্ণ হইবার আগেই গঙ্গাপ্রাপ্তি হইল, তাহাতে আমার পিতৃ-পরিবারের প্রত্যেকের মাতৃবিয়োগ তুল্য শোক, অসহনীয় হইয়া উঠিল। তাহার উপর নানাপ্রকার বৈষয়িক বস্ত্রাট পিতৃদেবকে নিতান্ত কাতর করিয়া তুলিল। শিশুকালে পিতৃহীন, বাল্যে মাতৃহারী ও যৌবনে একান্ত স্নেহময়ী মাতৃসমা ভগিনীর অসময়ে মৃত্যুতে পিতৃদেব সংসারে পুনর্বার একেবারেই অসহায় অবস্থায় দাঁড়াইলেন।

ভগিনীর মৃত্যুর পরে জ্যেষ্ঠতাত ও পিতৃদেব দুইজনই বিদেশে এবং পিসি-মাতার তিনজন বধুগণসহ হরিপুরে রহিয়া গেলেন। তাঁহাদের অজ্ঞাতে পুরাতন কর্মচারিগণ পিতৃদেবদত্ত জমিদারী দখলের আয়োজনে দলে দলে পূর্ববঙ্গীয় লাঠিয়াল নিযুক্ত করিয়া গোপনে অগ্রসর হইতে লাগিল। তাঁহাদের মন্ত্রণুপ্তি ভেদ করিতে পারা গেল না। জমিদারী দখলের দিন স্থির হইল অথচ প্রভুদের নিকট সমস্তই অজ্ঞাত রহিল। আমাদের অতি প্রাচীন চণ্ডীমণ্ডপের আদিনায় সবু লাঠিয়ালের আড্ডা। প্রভাত হইতে না হইতে তাহার মালতী (মালনী) ভ্রাম্যবিষয়ক গান ধরিয়া লাঠি ও অস্ত্রাস্ত্র অস্ত্র সান দিতে বসিয়া বাইত। মাথায় সকলেরই লম্বা বাবরি চুল, গায়ে মেরজাই, কাল ফিতা পাড় ধুতি পরিধানে, কোমরে গোট বিছা, দুই হস্তে তাগা, ও আঙুলে স্বর্ণ অঙ্গুরীয়

এবং চক্ষে স্থরমা। অথরোষ্ঠি তাবুলরাগ রঞ্জিত, চেহারা সব স্থন্দর, দ্বিবা-  
পাতলা, শরীরের কোন খানে মাংসাধিক্য নহে, হাস্যে মুখভরা, ছোট ছোট  
ছেলে মেয়ে দেখিলে আনন্দে অধীর হইয়া ক্রোড়ে ধারণ করিয়া জবীভূত হইয়া  
যায়, কণ্ঠস্বর মমতায় পরিপূর্ণ, বাহিরে দেখিয়া বুঝিবার সাধ্য নাই যে ভ্রাম্মাচ্ছাদিত  
বৈশ্বানর। সেই সব লোকই যে রাজ্যে “গ্রামপল্লী লুটে লুটে ছারখার” করিয়া  
প্রয়োজন হইলে নরহত্যা পর্য্যন্ত করিতে পারে, তাহা বিশ্বাস করা বড় কঠিন।

প্রাচ্যের ঘোর বর্ষার অমাবস্তার রাত্রি চতুর্দিক অন্ধকারে আবৃত, অল্প অল্প  
বৃষ্টি পড়িতেছে, বাহিরে যাওয়া অসাধ্য, কিন্তু সন্ধ্যা হইতে লাঠিয়ালগণ দাকার  
যোগাড় যন্ত্রে ব্যাপৃত। সমস্ত লোকজন ব্যস্ত, জিজ্ঞাসা করিলে সঠিক কথা  
পাওয়া শক্ত। ভাব গতক দেখিয়া পিসিমাতায়া বড় চিন্তিত হইয়া উঠিলেন,  
দেখিতে না দেখিতে এক প্রহর রাত্রির মধ্যে সেই শত শত বলবান্ লাঠিয়াল  
ও পুরাতন হুঁচারিজন কর্মচারী এবং ভৃত্যগণ কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল।  
অস্তঃপুরে কোন সংবাদ পৌছিল না। পরিজনগণ সেই নিশীথ আধারে একান্ত  
দুর্ভাবনায় বসিয়া কাটাইলেন। রজনী প্রভাতে নিশাচরগণও ফিরিয়া আসিল।  
যত লোক গিয়াছিল, তাহার অর্দ্ধেকও প্রত্যাবর্তন করিল না, আর বাহারা  
ফিরিল, তাহার বাকী বেতনের জন্ম তাগিদ দিয়া সকলকে উদ্বিগ্ন করিয়া  
তুলিতে লাগিল। বেতন শোধের সঙ্গে সঙ্গে তৈজস পত্র সহকারে কে কোথায়  
যে চলিয়া গেল, তাহার তত্ত্ব পাওয়া দূরে থাকুক, কোন প্রকার চিহ্নমাত্র রহিল  
না। কোথায় বাড়ী, কোন্ গ্রামে বাস, কি নাম কেহ কিছু জানিত না।  
শিত্বদত্ত নাম সব গোপন, লাঠিয়ালের দলের নামও অস্পষ্ট, পরিচয় কেহ জ্ঞাত  
নহে। লাঠিয়ালেরা চিরকালই গৃহহীন, যখন বাহার অধীনে কাজ করে, তাহারই  
গৃহে থাকে এবং বিপদ সংঘটন হইলে কে কোথায় অস্ত্রহিত হইয়া যায়, সন্ধান  
করিয়া বাহির করা সম্ভবপর নহে।

সেই নৈশ অভিযানের তৃতীয় দিবসে সহসা দারোগা বক্সী জমাদার ও সারি  
সারি চৌকীদার আসিয়া আমাদের কাছারী বাড়ী ঘিরিয়া ফেলিল ও তৎক্ষণাৎ  
সকল রহস্য চারিদিকে প্রচার হইয়া পড়িল। সেই ভয়ানক রাজ্যে সকল  
লাঠিয়ালসহ আমাদের কর্মচারীগণ অপর পক্ষের “জালেখরের” কাছারী আক্রমণ  
করিয়া সর্ব্বথ লুণ্ঠপাট করে এবং অস্ত্র পক্ষীয় লোকজন আত্মরক্ষার্থে বাধা  
দেওয়াতে মহা দাঁদা বাধিয়া যায় ও তাহাতে বহুসংখ্যক লোক খুন জখম হয়।  
কত লোক যে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল তাহার কোনই হিসাব পাওয়া যায়  
না। এই জনরব মাত্র লোক প্রমুখাৎ শুনা গিয়াছে যে, বড়াল নদীর সাধা জল  
নরশোণিতে লোহিতবর্ণ ধারণ করিয়াছিল। সর্ব্বাপেক্ষা শোচনীয় দুঃখাবহ ঘটনা  
এই, আমাদের লাঠিয়ালের স্ত্রীসকল সর্দার “লাল খা” প্রতিপক্ষের সহিত লাঠি  
খেলেতে খেলিতে হঠাৎ একটা বৃহৎ গাছ বাধিয়া পড়িয়া গিয়াছিল ও অস্ত্র দলের

একজন ভদ্রলোক প্রতিদিন পয়সার হইয়া খড়গাঘাতে তাহাকে কাটিয়া তাহার দেহ এক স্থানে ও শির অস্ত্রস্থ ভূতিকাভলে পুঁতিয়া দিয়া পলায়ন করে। একজনের কিবা এক দলের সঙ্গে লাঠি যুদ্ধের সময় অপরের তাহাতে ঐরূপ ভাবে আক্রমণ করা বা যোগ দেওয়া নিয়ম নহে। লাঠি খেলিবার সময় কখন বা লাঠিয়ালগণ সম্মুখে অগ্রসর হয়, আবার পশ্চাদ্গত হয়, সে কোশল ও নিয়ম বাহারা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, তাহারা লাঠি খেলার স্বকোশল ও ক্ষমতা বুঝিতে পারিবেন। পূর্বকালে প্রত্যেক জমীদার গৃহের ভূত্যাগণ পর্য্যন্ত স্বেচ্ছা লাঠিয়াল ছিল এবং সড়্‌কী চালাইতে জানিত। নতুবা দস্যুহস্ত হইতে ভদ্রলোকের কল্যাণ বঞ্চিত হইত। যাতায়াতের পথে সম্মান ও জীবন রক্ষার উপায় ছিল না। প্রাচীন ধনবানের পুত্রেরা লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে লাঠিখেলা ও সড়্‌কী বন্দুক চালান শিখিতেন। অস্ত্রকার বৈচিত্র্যহীন নিরাপদ জীবন ও নিরুদ্বেগে গৃহবাস সেকালে ছিল না। দাঙ্গা হাঙ্গামা লুটপাট, সর্বদা দস্যুভয় লাগিয়াই থাকিত।

“লাল খাঁর” এই ভয়ঙ্কর অকাল মৃত্যু শোকে তাহার জ্যেষ্ঠ “কালু খাঁ” আত্মহারা হইয়া সহসা শোকাবলুচিতে থানায় বাইয়া এতলা দিয়া “হরত হালের” জ্ঞান একেবারে ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট গোপনীয় কথা সকল প্রকাশ করিয়া বিচার প্রার্থনা করে। লাল খাঁ একটা মানুষের মত মানুষ ছিল, তাহার এই শোচনীয় মৃত্যুতে সে সময় চতুর্দিকে একটা হৈ-চৈ পড়িয়া বিপদের সীমা পরিসীমা রহিল না। লাল খাঁর মৃতদেহ তুলিয়া তাহার দাদা কর্তৃক স্নাত্ত হইলে সমস্ত আসামী পাবনায় চালান হইয়া বাইতে লাগিল। পথে ঘাটে দুই পক্ষের কোন নির্দোষী লোকও বাহির হইতে পারিত না, বাহাকে পাইত তাহাকেই ধরিয়া ফেলিত। “কালু খাঁ” সরকারী সাক্ষী স্বরূপ পুলিশের সঙ্গে রহিয়া সাহায্য করিতে লাগিল। কোন লাঠিয়াল পূর্বে এ প্রকার দলের নিয়ম বিরুদ্ধ কার্য করে নাই। “কালু খাঁ” কনিষ্ঠের শোকে অত্যন্ত অধীর হইয়া এইরূপ করিয়াছিল। পিতৃদেব ও জ্যাঠামহাশয় এ বিষয় অনভিজ্ঞ ও নির্দোষ হইয়াও আসামী মধ্যে পরিগণিত হইলেন এবং মোকদ্দমা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত প্রবাসে রহিয়া গেলেন।

এমন ভয়াবহ দাঙ্গা ও মারামারি কাটাকাটি রাজসাহী জেলার কখনও হয় নাই ও ভবিষ্যতে হইবে না। এ একটা ছোট-খাট রাম রাবণের যুদ্ধ বিশেষ। কত লোকের বীপাস্তর, বার চৌদ্ধ বৎসর কারাদণ্ড হইয়া গেল এবং অধিকাংশ লোক প্রাণভয়ে গৃহবাস ছাড়িয়া ফকিরী গ্রহণ করিল। আর আমাদিগেরও প্রায় সর্বস্বান্ত হইয়া গেল। সিপাই বিদ্রোহ পরে যেমন “নানাসাহেবকে” ধরিবার জন্য ইংরাজ গবর্ণমেন্ট স্বর্ণ মর্ত্য পাতাল খুঁজিয়া “হয়রাণ” হইয়াছিলেন, এ সময়েও তেমনি হইল। কত সন্ন্যাসী বৈরাগী মৃত হইয়া আসিয়া বিচারে নিষ্কৃতি লাভ করিল তবুও লাল খাঁর যথার্থ হত্যাকারী “তালুকদার মহাশয়কে”

কেহ ধরিতে পারিল না। দলে দলে পুলিশ কর্মচারী কর্মচ্যুত, ম্যাজিষ্ট্রেট স্থানান্তরিত ও চৌকীদারগণ দণ্ডিত হইয়া কে কোথায় চলিয়া গেল। পুরস্কার বিজ্ঞাপনে মুদ্রিত করিয়া হাটে বাজারে গ্রামে গ্রামে দেওয়া হইল, দামামা কাড়া গিটাইয়া পাড়ায় পাড়ায় অর্থ প্রলোভন দেখান হইল, কিন্তু ব্রহ্মহত্যা পাপের ভয়ে হত্যাকারীকে কেহই ধরিল না। সর্ব্ব চেষ্টা অর্থব্যয় বুঝা হইল মাত্র। “জালেবরের” সে লড়াইয়ের বৃত্তান্ত আমরা আশৈশব যেমন শুনিয়াছি এক্ষণে আবার আমার ভ্রাতৃপুত্র পুত্রৌগণও তেমনি শুনিতেছে। পুরাতন ভৃত্যবর্গ আত্মীয়স্বজন ও বাহারা স্বীপাস্তর হইতে দ্বাদশ চতুর্দশ বর্ষ পরে প্রত্যাগত, জাহারা এ কথা কদাপি বিন্দুত হইতে পারেন না। সেই কাল রাজির দুর্ঘটনা আমাদের পরিবারগণের মধ্যে চিরস্মরণীয়। সে বিয়োগান্ত নাটকের শেষ অধ্যায় বতই দুঃখজনক হউক না রাজস্বারে কাহারো যে প্রাণদণ্ড হয় নাই ইহাতেই আমরা স্থবী। পিতৃদেবের স্বর্গে অনেক ছুটিসহ ঋণ চাপিয়াছিল। তিনি নিজের স্বথাসর্ব্ব্ব দিয়া অনাহার অনিদ্রায় তাহা পরিশোধ করিয়া ঋণমুক্ত হন। আমার তিন বিধবা পিতৃঘনা এই মোকদ্দমার সমুদায় তত্ত্বাবধান এমন সূচাক্রুরূপে সম্পন্ন করিয়াছিলেন যে তাহাতে অধিকাংশ নির্দোষ ব্যক্তি নিরাপদে কারামুক্ত হইয়াছিল এবং হাইকোর্টের বিচারে তাঁহাদের বিচক্ষণতা ও বুদ্ধির বহুতর প্রশংসা হইয়া তাঁহাদের নাম সাক্ষীদ্রোণী হইতে উঠিয়া যায় এবং তাঁহারা এ সম্বন্ধে স্বাধীনতা প্রাপ্ত হন।

আমাদের পারিবারিক মোকদ্দমার নিষ্পত্তি পরেই আবার নাটোর রাজ-বাড়ীর পোস্তপুত্রের মোকদ্দমা উপস্থিত হয়। পিতৃদেবকে তাহার তত্ত্বাবধানের জন্য মহারাগী কৃষ্ণমণি অত্মরোধ করিয়া কলিকাতায় লইয়া যান। মাতৃঘণার স্নেহাত্মরোধ উপেক্ষা করা তাঁহার পক্ষে অত্যন্ত কঠিন ছিল। পোস্তপুত্র, কুমার বাহাদুর গোবিন্দনাথ অতি বালক, তিনি অসিদ্ধ প্রমাণ হইলে বড় তরফ ভালিয়া যায়। বাহাতে রাজবাটী বজায় থাকে এবং পোস্তপুত্র সিদ্ধ হয় তাহার জন্য পিতৃদেব অক্লান্ত পরিশ্রম ও অশেষ রেশ স্বীকার করিয়া কলিকাতায় নির্ব্বাসিত প্রায় থাকিয়া রাজবাড়ী রক্ষা ও পোস্তপুত্র সিদ্ধ করিয়া সকল কষ্ট সার্থক জ্ঞান করিয়াছিলেন। সে সকল রাজকাহিনী পুনর্ব্বার তুলিতে বাইলে আর এক নূতন উপস্থাপন আরম্ভ করিতে হয়; কাজেই তাহাতে অগ্রসর হইতে পারিলাম না। আমিই শিতামাতার প্রথম সন্তান, জন্ম মাতামহালয় পাবনা জেলার বাগে। দুর্গাপূজার পূর্ব্ব পঞ্চমীর দিন চারিদিকে নববৎ, পূজার বাজ ও মহামায়ার আগমনের আনন্দ, গৃহের বালক বালিকা নববস্ত্রে সজ্জিত এবং আত্মীয় কুটুম্ব প্রাঙ্গণ পরিপূর্ণ, এমন সুদিনে আমার পৃথিবীতে আগমন। ভাগ্যবতী স্নলক্ষণা কস্তা গণনার ঠিক হয় তাহার প্রমাণ কিছু জীবনে কখন পাওয়া যায় নাই। সে কালের প্রথাভ্রাতারে আকিনার কুঁড়েরে আমি

অগ্নিরাহিলাম, এবং দলে দলে প্রতিমা দর্শনপ্রার্থীগণ আমাকে একবার না দেখিয়া বাইতেন না। বুকেরা নাকি দেখিয়াই বলিতেন “কুঁড়ের ছয়ারে দেখি রাকাক্রমুখী।” বাগ হইতে হরিপুর তিন দিবসের জল পথ। তখন তারের খবর ছিল না, লোক দ্বারা শুভ অন্তত উভয়বিধ সংবাদই পাঠান হইত, আমারও জন্ম সমাচার ভূত্যা প্রমুখাথ প্রেরিত হইল। বিজয়া দশমীর বিসর্জনের ঘাটে ভ্রাতৃপুত্রীর জন্ম সংবাদ পাইয়া সে দিনের সমস্ত নুতন পরিচ্ছদ, সুবর্ণ অকুরীয় ও আরো কিছু নগদ অর্থ জ্যেষ্ঠতাত মুক্তহস্তে ভৃত্যকে পারিতোষিক দিয়াছিলেন ও আনন্দে পরিজনদিগকে স্বয়ং বাইয়া সংবাদ দিয়া পরিতুষ্ট করিলেন। আজকালের দিনে এক পরসার কার্ড বা ছয় আনার তারের খবরে পুত্র কন্টার জন্ম সমাচার পাঠান হয়। পারিতোষিকে কাহারো কোন অর্থ ব্যয় হয় না। সেকালে সে প্রথা ছিল না, প্রাচীন দাসদাসীগণ শুভ সংবাদ বহন করিতে বাইয়া শাল, দোশালা, বালুচরী চেলী, আশমানতারা, নয়নতারা সাড়ী প্রভৃতি এবং বটী থালা কলসী পুরস্কার পাইয়া এক বৎসরের আহারের সংস্থান লইয়া গৃহে ফিরিত। আমার জন্ম সংবাদ দানে ভৃত্য অনেক লাভ করে। প্রজারা পর্যন্ত চাঁদা তুলিয়া অর্থ একত্র করিয়া তাহাকে টাকা দিয়াছিল। তৎকালে টাকার ভেমন চলন ছিল না, কড়ি সর্বকার্যে চলিত। এক কাহন কড়ি পাইলে লোকে কত কৃতার্থ জ্ঞান করিত। অত টাকা পাইয়া সে গরিব বেচারি চাকর যে আফ্লাদিত হইয়াছিল তাহা আমি এখনও কল্পনা করিয়া স্থখী হই। স্থখ দুঃখের স্মৃতিই আমাদিগকে জীবিত রাখে। স্মৃতি না থাকিলে আমরা কিরূপে বাঁচিতে পারি? স্থখের স্মৃতি যেমন সুখাবহ, দুঃখের স্মৃতিও তেমন দুঃখজনক, তথাপি অতীত কখন ভুলিতে চাহি না। একদিন বাহা অত্যন্ত স্থখের ছিল আজ তাহা নাই বলিয়া কাদিব তবুও সেই পবিত্র স্মৃতি বিন্ধত হইতে চাহিব না। জগতের নিয়মই এই।

আমাদিগের রাজসাহীর আচার ব্যবহার ও সামাজিক নিয়ম সব এ অঞ্চলের সঙ্গে মিলে না। পুত্র কন্টার অন্নপ্রাশন কখন মাতুলালয়ে হইবার প্রথা নাই, আমারও তাহা হয় নাই। নয় মাস বয়সে শুভ দিনে পিজালয়ে আমার অন্নপ্রাশন হয়, নাম অনেক বাছিয়া বড়পিসিমাতা “প্রসন্নময়ী” দিয়াছিলেন। তখন গহনা পরা এখনকার মত ছিল না, সাজসজ্জাও অন্তরূপ। আমার হাতে রূপার বালা, গলায় সুবর্ণ কর্ণমালা, মাথায় সোণার চূড়া ও পায়ে নুপুর ছিল। বাঘরা কুর্ভা চাদর এবং নানাবর্ণের নাগরা জুতা পরিতাম। কপালের উপর থরকাটা ও কাধের পাশে জুলপি ছিল। বিবাহের পরে সে সব সাজের পরিবর্তে অল্প অলঙ্কার পরিতে হইত। হাতে বঁকি চূড়ী, নারিকেলফুল, পৈছে, গলায় চাপকলি, তুলসী-দানা, কাণে কদম্বফুল পিপুলপাতা, নাকে বেলর, কোমরে গোট ও পায়ে মল, শুকরী পঞ্চম। জুলপি তখন আর থাকিত না। কপালে সিঁথিপাটী থাকিলেও



সন্ধান না হওয়া পর্যন্ত ধরকাটা রাখা হইত। গৃহিণীদিগের হাতে বাউটী, ছোন, পাঁচদানা, কঠে কামরাদা হার, নাকে নথ, কাণে কড়ি কিষা ঢেঁড়িঝুমকা, কোমরে চন্দ্রহার, পায়ে ব্যাকমল, এই সকল পরিয়া নিমন্তে সিন্দুর কোঁটা দিয়া ও লাল চেলীর সাড়ী পরিধান পূর্বক যখন তাঁহারা শারদীয়া পূজার সময় মহা-মায়ার পদে অঞ্জলি দিবার জন্য যুক্তকরে আসিয়া একত্র দাঁড়াইয়া ভক্তিভরে প্রতিমার পাদপদ্ম পূজা করিতেন, সে সময় এই অভিনব দৃশ্য দেখিবার জন্য কর্তারাও অন্তঃপুরে আসিয়া অন্তরাল হইতে গৃহিণী স্তন্দরী ও বধুগণকে দেখিয়া নয়ন মন পরিতৃপ্ত করিতেন।

আমরা শৈশবে অনেক সময়ই বালক বেশে কাছারী বাড়ীতে সরকারের নিকট পড়িতে বাইতাম। পিতৃদেব ছুতার মিস্ত্রী দ্বারা বার স্বর ও ছত্রিশ ব্যঞ্জন বর্ণ ধোদিত করিয়া অক্ষর পরিচয় করাইয়াছিলেন। পাঠশালায় বাইবার রীতি ছিল না। গ্রাম্য কালীবাড়ীর স্কুলে গৃহের বালকগণ পড়িতে বাইত। আমরা কেবল-মাত্র প্রাতে একবার তালপত্রে লেখা শিখিতাম ও দাতাকর্ণের উপাখ্যান প্রভৃতি পড়িতাম। তাহার পর সমস্ত সময় গৃহকার্য শিক্ষা দেওয়া হইত। সর্বপ্রথমে শিব গড়ান ও দেবार्চনার আয়োজন সব নিতুলভাবে শিখাইতেন। ক্রমে রন্ধন ও পরিবেশন এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে শিল্প কার্য্যও শিক্ষা হইত। পাথরে ছাঁচ কাটা, শিকা তৈয়ারি, কাঁথা সিলাই, নারিকেলের চিড়ে, জিরে, পদ্মচিনি, ধানের মালা, কঙ্কণ, নানা প্রকার আলিপনা ও শুভকার্য্যে পিঁড়িচিত্র এবং পঞ্চরঙ্গের গালিচা, হলিচা প্রভৃতি বিবিধ কার্য্যকর ও সৌখীন শিল্প শিক্ষা দিতে পরিপক্ব গৃহিণীরাই গুরুগিরি করিতেন। যে বালিকা স্বশুরালয়ে বাইয়া প্রথমে স্তন্দররূপে শিব গড়াইতে পারিতেন না, তাহার পিতামাতার বড় লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হইত। বধুমাতা “ম্লেচ্ছ কন্যা” নামে অভিহিত হইয়া হাত্তাস্পদা হইতেন। অপর দিকে এক এক সমারোহের বিবাহ সভায় শিল্পনিপুণা মহিলাগণ কর্তৃক পঞ্চবর্ণের চিত্র বিচিত্র গালিচায় বরধাত্রী বসিতে বাইয়া অপ্রস্তুত হইয়া চারিদিকে হাসির তরঙ্গ তুলিয়া দিতেন, তখন গৃহিণীদিগের প্রশংসা ধ্বনিতে আসর মুখরিত হইয়া উঠিত।

“নীতিকথায়” কাদাখোঁচার গল্প পড়িয়া দেশে আমার যে বিজ্ঞা হয়, তাহা আবার সঙ্গিনীগণের সহিত খেলা ধূলায় কতক তুলিয়াও বাই। পিসিমাতাদিগের নিকট প্রত্যহ “রামায়ণ, মহাভারতের অমৃতময় কথা” শুনিয়া শুনিয়া এত আয়ত্ত হইয়া গিয়াছিল যে তাহা আর শিখিবার জন্য নূতন করিয়া পড়িতে হয় নাই। প্রতিদিন সন্ধ্যার প্রদীপ জ্বলাইবার পরেই ছোঁটাতোতের কনিষ্ঠ পুত্র ৬কালী-এসর দাদা গানের স্বরে “গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিনী” ও ঐ দুই পুস্তক উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিতেন। আমাদের ছোট বড় দুই তরফের সকলে—সুত্র সুত্র বালক বালিকা পর্যন্ত অতি মনোবোগ সহ তাহা শুনিয়া আনন্দিত হইতেন। গঙ্গার স্তব, “অঙ্গদের রায়বার” ও জ্যোপদীর স্বরধর সভায় ব্রাহ্মণবেশী অর্জুনের লক্ষ্যভেদ

প্রভৃতি মধুর কণ্ঠে এমন স্থললিত তান লয় সংযোগে গাহিতেন যে শ্রোতাগণ একেবারে মুগ্ধ ভাবে কত রাজি বসিয়া শুনিতেন। প্রাচীন দাস দাসীরাও ভক্তির ভরে কাঁদিয়া কেলিত।

শৈশবে আমরা সব বালিকা একত্র মিলিয়া কাস্তিক মাসে “বমপুতুর” ও বৈশাখে “পুণ্যপুতুর” \* পূজা ও “নিত্যহৃন্দরী” “ফলদানের” ব্রত ইত্যাদি করিয়া তবে জল গ্রহণ করিতাম। আমাদের সাহায্যার্থে দুই বাড়ীর বালকগণ একত্র হইয়া কত ফুল ফল আনিয়া দিত। যে বালিকা যাহার অধিক প্রিয় ও খেলার সঙ্গিনী, সে তাহাকে আবার বেশী ম্যাত্রায় সকলি দিয়া পরিতুষ্ট করিত। তাহাতে কখন কখন কলহ হইয়া বাইত। পল্লীগ্রামের বালক বালিকা সর্বদা এক সঙ্গে ক্রীড়া করিয়া থাকে। সবই আপনাদের লোক, দাদা, ভাই, কাকা, মামা, লম্বা করিবার সম্পর্ক কাহারো সহিত নহে। তখন ব্যাটবল ফুটবল খেলা ছিল না, “হাডুডু, চোর চোর, ডাণ্ডাগুলি” সম্বরণ ও ঘুড়ি উড়ান প্রধান খেলা ছিল। অনেক বালিকা তাহাতে যোগ দিত। আমি আশৈশবই শারীরিক পরিশ্রমে কাতর ও শরীর তেমন সবল না থাকার জন্য খেলাতেও প্রাধান্য লাভ করিতে পারি নাই।

সে কালের ঘুড়ি উড়ান এ কালের বালকগণের কল্পনার অতীত। পল্লীর বৃদ্ধরাও সে ঘুড়ি উড়াইবার সহচর থাকিতেন। “চাউস” “কোয়াড়” “মাহুঘ” এই সব বৃহৎ বৃহৎ ঘুড়ি উঠে শূন্যে উড়াইবার সময় গ্রামের আবাল বৃদ্ধ বনিতা একত্র হইয়া সে তামাসা দেখিতে আসিতেন। এক একখানা ঘুড়ি সপ্তাহ ধরিয়াও উড়িত, তাহার উড়িবার গর্জন বহুদূর হইতে শুনা বাইত। যে দল সেই ঘুড়ি উড়াইয়া জয়লাভ করিত, তাহারা ঢাক বাজাইয়া “মঙ্গল চণ্ডীর” পূজা দিয়া ব্রাহ্মণ ভোজন করাইত। আমার ৮কালীপ্রসন্ন দাদা এই সকল খেলার অগ্রগণ্য ও দলের অধিপতি ছিলেন, তাঁহাকে বাধ দিয়া গ্রামে কোন খেলাই হইতে পারিত না। তিনি শীকার করিতে, “কৌচ” ধরা মাছ মারিতে, ধনুক চালাইতে এবং লাঠি খেলিতে অধিতীয় ছিলেন। সমস্ত হরিপুরের ভদ্রলোকের ও কৃষকগণের বালকেরা তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ সতত ঘুরিয়া বেড়াইত এবং তিনি বাহা আজ্ঞা করিতেন, তাহাই সম্ভটচিন্তে সম্পাদন করিত। আজ্ঞাবহ ভৃত্যবৎ তাঁহার

\* পুণ্যপুতুর পূজার মন্ত্র।

“পুণ্যপুতুর পুণ্যমালা  
কে পূজে ঠিক দুপুর বেলা?”  
“আমি সতী লীলাবতী  
ভায়ের বোন ভাগ্যবতী,  
শিব তুল্য স্বামী চাই,  
কাস্তিক গণেশ কোলে পাই,  
যরণ হয় জাহ্নবী জলে  
এই বর মাগি চরণ তলে।”

বাক্য শিরোধার্য করিয়া চলিত। তিনি একটি ছুত্র রাজা বিশেষ ছিলেন, যদিও অতি ছরস্ক বালক, তবু দয়া মায়ী স্নেহ মমতায় সর্বজনীন হইয়াছিলেন। লেখা পড়ায় মনোবোগ ভেমন দিতেন না, অত্যন্ত মেধাশক্তি থাকায় বাহা পড়িতেন তাহাতেই ক্লাশে সকলের উপর হইতেন। গ্রামবাসীরা একবাক্যে বলিতেন “এমন বীর ও উদার হৃদয় বালক এ অঞ্চলে আর নাই।”

গ্রামে বালকদিগের আর এক উপজীব ছিল “নষ্টচক্রে” দিন। সে রাজি বালকগণ গৃহস্থের কলের বাগান এবং তরকারী সব লুঠ করিত, দলবদ্ধভাবে গ্রামান্তরেও চলিয়া যাইয়া “নষ্টচক্রে” দেখার দোষ খণ্ডাইয়া আসিত। তাহাদের সে দোরাস্য সকলে হস্তমুখেই সঙ্ক করিতেন ও যে গ্রামেই নিশীথে যাইয়া উপস্থিত হইত, সেখানেই তাহাদের দস্যুতার চিহ্ন সর্বত্র দিব্য বিস্তারিত থাকিত। সে জন্ত কেহ কখন অভিভাবকের নিকট অহুযোগ করিতে আসিতেন না। শ্রাবণ মাসে বড়াল নদী বখন কানায় কানায় ভরিয়া উঠিত, খাল, বিল, ঝিল, জল-প্রবাহে অপূর্ব শ্রী ধারণ করিত, সেই সময় আমাদের গ্রামের বারোয়ারী পূজা হইত। সে এক অপূর্ব মহোৎসব। নদীবক্ষে অসংখ্য সজ্জিত তরঙ্গী, কত রাজা মহারাজা তাহাতে বাস করিয়া পূজা দেখিতেন। অতীব জন কোলাহল, বাজার বিপণি মনোহর দ্রব্যে শোভাময়। মাঠে ছোট ছোট ঘর ও তাহাতে গায়ক গায়িকার দল বাসা বাঁধিয়া উৎসবে যোগদান করিতে আসিত। দানের হিসাব ছিল না, আহারের আয়োজন রাজহর যজ্ঞের তায় “দীয়তাং ভূজ্যতাং” মুক্তহস্তে অতিথি সেবা চলিত। বড়মাছের নোকায যে সিধা দেওয়া হইত—তাহাতে দুচারিটা জাঁকের বিবাহ সম্পন্ন হইয়া যাইতে পারিত। “সিধুলী, আমহাটর” দধি, নাটোরের তুঁতকল ও হরিপুরের অবাক সন্দেশের বিগুণ মূল্য বাড়িয়া দুশ্রাপ্য হইয়া উঠিত। পাঠশালা বন্ধ। ছেলে মেয়ের অল্প কোন কার্য থাকিত না, কেবল আহার। স্বস্থকায় পল্লীর বালক বালিকা অতি ভোজনেও রোগে শয্যাগত হইত না। সেই একটা তখনকার স্থখের বিষয় ছিল।

সেকালে “গোবিন্দ অধিকারী, মধুসূদন-কান্ ও লোকা ধোণা” অতি দক্ষ বাজী গায়ক ছিল। তাহাদের বাজা শুনিতে শুনিতে রজনী প্রভাত হইয়া যাইত, কর্তারা আত্মহারা হইয়া চারি ছয় দণ্ড বেলা পর্যন্ত গানই শুনিতেন, তাহার পর প্রাপ্য টাকার সঙ্গে সঙ্গে গাজের শাল, দোশালা, শাড়ী, ধুতি, উত্তরীয় রানীকৃত ভাবে চারিদিক হইতে বর্ষণ হইত। এক এক সময় বাবুরা গৃহিণীগণের নিকট হইতে সোণা রূপার গহনা মাঞ্জিয়া আনিয়া দিতেন। অস্তঃপুর বাসিনী মহিলারা তাহাতে কিছুমাত্র আপত্তি করিতেন না। পূজাস্তে ছ’চারিমাংস কেবল মাঠে ঘাটে শুধু “গোবিন্দ অধিকারীর মা বশোধার কৃষ্ণ বিচ্ছেদের করুণ গীতি, লোকনাথের মশান ও মধুকানের (কিন্নর) মাখুর” রাখাল কণ্ঠে প্রতিনিয়ত হইত। এখন সেক্ষণ মধুর বাজা আর নাই। রঙ্গালয়ের ভাবভঙ্গী অল্পকরণে এখন যে বাজা

গান হয়, সেটা ছোট খাট অভিনয়ের বিসদৃশ রূপান্তর মাত্র।

দ্বিবলে পুরনারীগণ কালী প্রতিমা দেখিতে বাইতে পারিতেন না। বারো-সারীর শেষ দিনে, সমস্ত অভ্যাগত ভক্তলোকদিগকে হানাস্বরিত করিয়া বিপ্রহর নিশীথে রমণীরা সব প্রতিমা দর্শনে বাইতেন। সঙ্গে দাস দাসী পাইক সর্দার “বডিগার্ড” স্বরূপ থাকিত। অস্ত্র পুরুষ সেখানে বাইতে পারিত না। গান্ধিকার রাখাক্ষ ভক্তি বিষয়ক চপের গান চলিত, আর বিপণি সব তেমনি খরে খরে সজ্জিত থাকিত। বধুমাতারা ও কল্যাণ ইচ্ছামতন দ্রব্য সামগ্রী ক্রয় করিয়া বড় সুখানুভব করিতেন। যদি একালের মতন ছবি উঠাইবার নিয়ম থাকিত তাহা হইলে এই বারোয়ারী পূজার সমারোহের প্রতিকৃতি তুলিয়া রাখিলে ভাবীবংশধরগণ এক্ষণে দেখিয়া সুখী হইত। যে দিন যায় তাহা ত আর ফিরিয়া আইসে না, স্মৃতিতে কেবল চিহ্নমাত্র রহিয়া যায় ও কালক্রমে তাহাও আবার ক্ষীণতর হইয়া লুপ্তপ্রায় হইতে থাকে।

“জালেখরের” হাঙ্গামার চূড়ান্ত মীমাংসার কয়েক মাস পরে আবার শত্রুপক্ষ আমাদিগের বাড়ী হঠাৎ রজনী যোগে আসিয়া লুটপাট করিবে এই জনরব চতুর্দিকে এক সময় রটিয়া যায় এবং পুরুষ অভিভাবক গৃহে না থাকায় জ্যোতি-মাতারা অতিশয় ভীতা হইয়া নাটোর রাজধানীতে মহারাজী কৃষ্ণমণি দেবীর নিকট সংবাদ পাঠান। সেখান হইতে ডুলি পালকী বরকন্দাজ ও পুরাতন ভৃত্য প্রভৃতি আসিয়া রাজিকালে মাতৃঠাকুরাণী, জ্যোতিমাতা ও অন্যান্য মহিলাগণকে জঙ্গল পথে লুকাইত ভাবে লইয়া যায়। মূল্যবান সামান্য অলঙ্কারের পেটিকা মাত্র সঙ্গে থাকে, দহাভয়ে নগদ টাকা সবই ফেলিয়া বাইতে বাধ্য হন। আমি তখন অতি ক্ষুদ্র বালিকা। গভীর জঙ্গল ভেদ করিয়া লোক জন সহ ডুলি বাইতেছিল। “মা বোমামুখ”, অবগুণ্ঠনে মূখ্যবৃত্ত, কাহারো সঙ্গে কথা বলিতে পারেন না, বিশেষতঃ রাজবাড়ীর সব লোক, তাহাদিগের সম্মুখে বাহির হওয়াই নিষেধ। জ্যোতিমাতার ডুলি অগ্রেই চলিয়া গেল। বরকন্দাজের দল ও বাহকরা অধিকাংশ তাঁহার সঙ্গে। আমাকে লইয়া মা পশ্চাৎ পড়িয়া রহিলেন। নিবিড় বনরাজি, অসমতল পথ, মল্লয় সমাগম রহিত। মা ডুলির ঘেরাটোপ উঠাইয়া ভয়ে ভয়ে সব দেখিতে দেখিতে বাইতেছিলেন, এমন সময় বরকন্দাজরা ডুলি অনেক পশ্চাৎ পড়িয়াছে ও অন্ত ডুলি দূরে চলিয়া গিয়াছে দেখিয়া বাহকগণকে তাড়া ও গালি দেওয়াতে তাহার অতিবেগে চলিতে লাগিল ও ক্ষুদ্র আমি সে বেগ সঞ্চ করিতে না পারিয়া একেবারে মাতৃকোড় চ্যুত হইয়া নীচে পড়িয়া গেলাম। লজ্জাবশতঃ মা প্রথমে কিছু বলিতে পারেন নাই, পরে যখন দেখিলেন সাহকেরা চলিয়া যায়, তখন তিনি কাঁদিয়া উঠিলে বরকন্দাজ সব ছুটিয়া আসিয়া ব্যাপার কি দেখিবার জন্ত চারিদিকে খুঁজিতেই আমাকে জঙ্গলের বুদ্ধিকায় পতিত দেখিয়া উঠেঃখরে “আরে রাম রাম” বলিয়া ডুলিয়া আদরে আবার মাতৃকোলে দিয়া দিল। আমি

যে অমন অস্থানে পড়িয়াও কাঁদি নাই ও দিয়া তাকাইয়া সব দেখিতেছিলাম তাহাতে তাহাদিগের অভ্যস্ত আয়োদ বোধ হইয়াছিল এবং আমার শরীরের কোনখানে সামান্য আঘাতও লাগে নাই সেক্ষণ “সীতারাম” স্মরণ করিতে করিতে ভুলির লজ্জা আর ছাড়িল না। দোলা বধাকালে রাজবাড়ী পৌছিলে “মামণির” (মহারাজী কৃষ্ণমণি) নিকট খুব সুখ্যাতি ও কিছু উপহার লাভ হইয়াছিল।

নাটোরের বড় তরফের সহিত সম্পর্ক ও বিশেষ আত্মীয়তা থাকার জন্য ছোট তরফের সঙ্গে কুটুম্বিতা এবং বিবাহ উপনয়ন ও অন্নপ্রাশন উপলক্ষে নিমন্ত্রণে বাতায়াত ছিল। ছোটরাজা আনন্দ নাথ রায় বাহাদুরের সাদর নিমন্ত্রণে তাঁহার পুত্র কন্তার বিবাহে আমরা সকলেই গিয়াছিলাম। বড় তরফে অবস্থিতি ও ছোট তরফে খিড়কীর পথে সর্বদা যাওয়া আসা ও আহাতিদি হইত। বিবাহের মহা-সমারোহ, গান বাজনা নাচ তামাসা ও আতসবাজী, অবিশ্রান্ত আনন্দ কোলা-হল, আমরা বালকবালিকা আহাতি নিত্যা ত্যাগ করিয়া তাহাই দেখিতাম, শুনিতাম। আমার জ্যাঠামহাশয় সর্বের সর্ব, স্পষ্টবাদী ও রাজ তোবামদের ধার দিয়াও কখন যাইতেন না। তাঁহার নিকট সব সমান; “কেবা রাজা, কেবা প্রজা, নাহি জানে রাজসেবা” প্রকৃতির ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহাকে অপর সাধারণে খুব মানিয়া চলিত এবং রাজা মহারাজগণ তাঁহার সত্য কথা ও স্বাধীন ব্যবহার ভিতরে ভিতরে ভেদন পছন্দ না করিলেও বাহিরে খাতির দেখাইতেন। তবে তাঁহাকে কোন বিষয়ে প্রকাশ্য সভায় অপ্রতিভ করিতে পারিলে সুখানুভব করিতেন। অমন একটা জাঁকের বিবাহ, রাজসাহীর সমস্ত রাজকুলবর্গ ধনী গণ্য মান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নিয়ন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছিলেন। নাচ গানের মজলিসে লোকে লোকারণ্য, বালিকা প্রযুক্ত আমরাও সেখানে উপস্থিত ছিলাম। আমার হাতে রোপাবালা দেখিয়া জ্যাঠা মহাশয়কে অপ্রস্তুত করিবার জন্য ছোট রাজা বাহাদুর আমার হাত ধরিয়া সকলের সম্মুখে বলিয়াছিলেন “তুমি বড় চৌধুরীর ভাইবী, কেন রূপার বালা পারিয়াছ? সোণার বালা চাও?” ক্ষুব্ধ আমি, তাঁহার দিকে উদ্বালীন ভাবে তাকাইয়া হাসিয়া নাকি বলিয়াছিলাম “বড় মাহুঘের মেয়েরা রূপাই পরে, পরের সোণা গায় দেয় না।” আমার জ্ঞান ছোট বালিকার মুখে এই গর্বিত বাক্য শুনিয়া আসরে একটা হাস্তের কেলোহল পড়িয়া গেল, গায়ক বাদক ও নর্তকীরা পর্যন্ত এমন উচ্চহাস্ত করিয়া উঠিল যে, সে সভায় অনেকক্ষণ গান বাজনা নাচ থামিয়া গেল। জ্যেষ্ঠতাত আনন্দে উচ্ছ্ব-লিত হইয়া “এলো মা এসো” বলিয়া আমাকে একেবারে কোড়ে তুলিয়া লইলেন, আর ছোট রাজা লজ্জায় অধোমুখ হইয়া রহিলেন। এই ঘটনার পরেই জ্যাঠামহাশয় আমার হাতে সোণার “কাটা বালা” (পুরাতন গহনা বিশেষ) গড়াইয়া দিয়াছিলেন। সেই হইতে আমিও ছোট খাট একটা “হরিপুরের ঠাকুরঝির” মধ্যে গণ্য হইয়া গেলাম। আমাদের দেশে বাড়ীর ছোট বড় মেয়েরা

সকলেই “ঠাকুরবি বা বা ঠাকুরবি মহাশয়” নামে অভিহিত। গৃহে কর্তা কিম্বা বাবুজী মহাশয়ের ব্রাহ্মণ প্রযুক্ত ঠাকুর, তাহাদের কন্ডাপন তাই ঠাকুরবি। “দিদিবাবু” দিদিঠাকুরাণী ডাক এই অঞ্চলে এখনও নাই।

সিপাহি বিপ্লবের সময় আমি যে ঠিক কত বড় তাহা জানি না। তবে ছত্রভঙ্গ বিদ্রোহীগণ স্বংকালে উন্নতবৎ চতুর্দিকে দৌরাণ্ড করিয়া বেড়াইতেছে, জনসাধারণ তাহাদের ভয়ে গৃহের বাহির হইতে পারে না, সেই দুর্দিনে আমরা নৌকাযোগে মাতামহালয় হইতে শিজালয় হরিপুর কিরিবার পথে শুনিলাম সিপাহীরা সব আরোহীর নৌকা আক্রমণ করিয়া বাহা কিছু পাইতেছে তাহাই লুণ্ঠ করিতেছে। এই সংবাদে আমাদের নৌকার লোকজন অতীব ভীত হইয়া মার সঙ্গে আমাদেরও নৌকার কূঠরী মধ্যে গোপনে থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিল। বাল্য স্মৃতিতে কোতুল বশতঃ কেবলই তাহাদিগের সৈনিক বেশে নৌকায় আগমন প্রতীক্ষা করিয়া শেষে নৈরাশ্র সহকারে নির্বিশেষে গৃহ প্রত্যাগত হইয়া পরিবারদিগকে দুশ্চিন্তার হাত হইতে রক্ষা করিলাম। এই বিপ্লববহি নির্বাপিত হইবার পরই প্রতি থানায় পুলিশের সংখ্যা বৃদ্ধি ও কড়া পাহারার প্রথা প্রচলিত হয়। আমরা শৈশব হইতে জনপথে নৌকায় মাতামহালয়ে যাতায়াত করিতাম। ক্ষুণ্ণগামী নৌকা যখন ছায়াময় গ্রামপল্লী পশ্চাৎ করিয়া চলিয়া বাইত, কত শ্রামল প্রান্তর, সোষ্ঠবশালী জনপদ, সমুদ্র বৃক্ষ শ্রেণী এবং নয়নানন্দ ঘন তৃণাবৃত গোচারণের মাঠ দেখিয়া নেত্র মন পরিতৃপ্ত করিতাম। মনে হইত সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের স্বন্দর দৃশ্য যেন জীবন্ত আকারে জলের মধ্য দিয়া সঙ্গে সঙ্গে ছুটিয়া চলিয়া বাইতেছে। যেখানে যেখানে লোকালয়ের নিকট নৌকা ভিড়াইয়া হাট বাজার করিত, সেই সব স্থানে সরলা পল্লী বধূগণের কলসী কক্ষে ঘাটে আগমন ও তাহাদিগের সহিত কথাবার্তায় মুহূর্ত্তে পরিচিত হইয়া বাইতাম। ব্রাহ্মণ দেখিয়া তাহারা আবার আমাদের জন্ত ফল তরকারী দুগ্ধ ইত্যাদি অবাচিতে বিনামূল্যে নৌকায় আনিয়া দিয়া বাইত। সে কত স্বথের দিনের স্মৃতি, আজও ভাবিলে সুখানুভব হয়। আশৈশব প্রকৃতির মুক্ত শোভার মধ্যে প্রতিপালিত ও পরিবর্তিত বলিয়া জীবনের এত শোক দুঃখের ভিতর এবং বৈভবগীরী তীরে বসিয়া আজিও স্বভাবের সৌন্দর্য্যে আত্মবিস্মৃত। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে বাগে বাইতে হইলে পাকীতে বাইতে হইত। বাহক, দাস, দাসী, পাইক, সঙ্গে থাকিত। সকলদিন পথ চলার পরে রাজ্যে কোন গৃহস্থ ভবনে আশ্রয় লইয়া আহাতি করিবার নিয়ম ছিল। একবার আমরা না জানিয়া এক গোয়ালী ডাকাতেই বাড়ী উঠিয়াছিলাম। তাহারা মাকে পরমাদরে গৃহে লইয়া বিবিধ খাদ্য আনিয়া দিল ও রাজ্যে রন্ধনের যোগাড় করিয়া রন্ধন করিবার জন্ত বিশেষরূপে ধরিয়া পড়িল, এমন সময় পরিচারিকারা কি প্রকারে জানিতে পারিল যে “ডাকাতেই বাড়ী” এবং গৃহকর্তা স্বয়ং ডাকাত। শুনিয়া ত ভয়ে মায়ের মুখ শুকাইয়া গেল। তিনি ভীত ও

নিরুপায়ভাবে রুদ্ধনে অসম্মত হইয়া জ্যোৎস্না উঠিলেই চলিয়া বাইতে ব্যস্ত হইলেন। ডাকাতের দস্যাবৃত্তি বিধবা ভগিনী তখন সকল বুদ্ধিতে পারিয়া মাকে সাহস দিয়া বলিতে লাগিল “ভয় কি মা, আমি থাকিতে তোমার পায়ে কাঁটাও ফুটিবে না, তোমরা নিরাপদ। রুদ্ধন করিয়া অন্ন ব্যঞ্জন খাইয়া পাতের প্রসাদ দিয়া যাও, আমার দাদার মুক্তি হইবে।” মা তাহার সম্বন্ধে ব্যগ্র অহরোধ রক্ষা করিলেন এবং সেও চারিদিক রাত্রি থাকিতে মাকে নির্বিকল্পে গ্রামান্তরে পৌছাইয়া আসিল।

আমার পাঁচ বৎসর কয়েক মাসের ছোট আশু, পিতামাতার প্রথম পুত্র। তাহার জন্মের পরেই বাবা মার এমনি কঠিন পীড়া হইয়াছিল, যে জীবন সংশয়। তাহার। যদি ঈশ্বর কৃপায় আরোগ্য লাভ করিয়া উঠিলেন, তখন আবার নবপ্রসূত শিশুর জীবন লইয়া টানাটানি পড়িয়া গেল। পরিবারে সকলে যেখানে যে গণৎকার ওবা বৈজ্ঞ পাইতে লাগিলেন, তাহাকেই আনিয়া জীবন রক্ষার নানা প্রকার উপায় দেখিতেছিলেন। ভাগ্যগণনায় উঠিয়াছিল যে শিশু অতি ভাগ্যবান ও কাঁড়া যদি কাটাইয়া উঠে তাহা হইলে ভবিষ্যৎ জীবনের ফলাফল বড় “ইউনিক”। বাড়া, জলপড়া, সেকালের বাহা কিছু শিশু চিকিৎসা ছিল তাহাতেই শিশু সারিয়া শেষে বেশ সুস্থ সবলকায় হইয়া উঠে। আমাদের জন্ম মাতামহালয়ে; ছয় মাস বয়সে শিজালয়ে যাওয়া প্রথা। আশুকে লইয়া মাও সময় মতন হরিপুর রওনা হইয়া গেলেন। শুভ দিনক্ষণ দেখিয়া তাহাকে গৃহে আনয়ন করা হইল। পুরাতন নিয়মাহুসারে বাস্তবাজাইয়া পূর্বের কাছারী বাড়ীতে তুলিয়া গ্রামের গুরুজন সকলে দেখিলে অন্তঃপুরে লইয়া যাওয়া হইত ও প্রধান প্রধান প্রজারা কিছু কিছু নগর সম্মুখে ধরিত। আশুরও তাহাই হইয়াছিল। শিশুর হাতে টাকা দিলে কখনও মুষ্টিবদ্ধ করিতে পারিত না, শুনিয়াছি। জীবনে তাহার প্রমাণও প্রত্যক্ষ।

আশুর জন্ম বৎসরেই আমার জ্যেষ্ঠভাতপুত্র ৭নবকুমার চৌধুরী ঠাকুরদাদার \* প্রথম বিবাহ অতি সমারোহে হয়। শিশুদেব সে বিবাহে সবই করিয়াছিলেন ও বাড়ীর সকলে তাহাতে ভাবিয়াছিলেন, জ্যাঠা মহাশয় ভ্রাতুষ্পুত্রের অন্নপ্রাশনে শুব ধুমধাম করিবেন। কিন্তু নববধূর পাকস্পর্শের দিন আশুর মুখে ভাত দিবার প্রস্তাব শুনিয়া পিতা অভিমানে তাহা বন্ধ করিয়া দিলেন, সে বাজা অন্নপ্রাশন রহিত হইয়া গেল।

ব্রাহ্মণপুত্রের দশকর্ম রীতিমতন না হইলে চলিতে পাবে না। জাঁকজমকে

\* আমাদিগের অঞ্চলে বড় ভাই, কাকা, মামাদিগকে বাস্তব করিয়া “ঠাকুর দাদা, ঠাকুর কাকা ও ঠাকুর মামা” বলিয়া ডাকে। আর তেমনি দিদিকে “ঠাকুরাণী দিদি”, কাকীকে “ঠাকুরাণী কাকী”, মাসী, পিসী, মামী প্রভৃতি “ঠাকুরাণী মাসী মা”, “ঠাকুরাণী পিসী মা” ও “ঠাকুরাণী মামী মা” বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে।

অন্নপ্রাশন না হইয়াও আশুর মুখে ভবানীপুত্রের (নাটোর রাজের দেবদান) প্রসাদ দেওয়া হইয়াছিল এবং পিতৃদেব স্বয়ং নাম রাখিলেন “আন্ততোষ”। সর্ব জ্যেষ্ঠ সম্ভানের অন্নপ্রাশন আশাহুরূপ হইল না, তাহাতে মা কিছুমাত্র ক্ষণ হইলেন না, বরং ভবানীদেবীর প্রসাদই, তাঁহার আশীর্বাদস্বরূপ পুত্রের মুখে দিয়া তিনি পরিতুষ্ট বোধ করিলেন। পিসিমাতারা ইহাতে বড় অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন ও সম্ভ্রান্ত ভাবীকালে একটা গৃহ বিচ্ছেদের সূত্রপাত হইয়া রহিল।

আশুর পরে যোগেশ, তিন বৎসরের ছোট। এবার পিতৃদেব পিসিমাতাদিগের হস্তে দ্বিতীয় পুত্রের অন্নপ্রাশনের ভার দিয়া বনগ্রামে কার্যস্থানে রহিয়া গেলেন। শাস্ত্রাহুসারে জ্যেষ্ঠের উচিতরূপে “নান্দীমুখ” “বুদ্ধিশ্রদ্ধ” না করিয়া অন্নপ্রাশন হইলে কনিষ্ঠের তাহা হইতে পারে না। অগ্রে আশুর হইয়া ছোট ভ্রাতার মুখে ভাত দিতে হইবে। প্ররোহিত মহাশয়েরা পাঁজি, পুঁথি খুলিয়া তাহার আয়োজনে ব্যস্ত হইলেন, আর গৃহে কুটুম্ব আগমনের ধুম পড়িয়া গেল। এ অন্নপ্রাশনে বড় আমোদ, যুগল কুমার লবকুণের ত্রায়। সাড়ে তিন বৎসরের আন্ততোষ সর্বদা গহনা ও লাল পোষাক পরিয়া চন্দনচর্চিত ললাটে ছোট পুঁটে বর সাজিয়া চিত্রিত পিড়িতে ভাত খাইতে বসিয়া গেল। যোগেশ নয় মাসের, জ্ঞাতি ক্রোড়ে রহিল। সম্মুখে পঞ্চ ব্যঞ্জন ও উপাদেয় খাদ্যসামগ্রী সব সজ্জিত দেখিয়া ক্ষুদ্র আন্ত সুবর্ণ অজুরীয় পরিয়া জ্ঞাতি হস্তে পরমায় খাইবার প্রতীকায় না রহিয়া দিব্য খুসি মনে নিজহস্তে অন্নপ্রাশনের অন্নব্যঞ্জন খাইতে লাগিল। এই কৌতুকাবহ দৃশ্যে দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে উচ্চ হাস্যধ্বনি হইতে লাগিল। রসনচোকা নহবৎ বাগ্ধামিয়া গেল এবং আশু, যোগেশের, অন্নপ্রাশনের গল্পটা পল্লীর চারিদিকে প্রচারিত হইয়া পড়িল। আশুর অন্নপ্রাশন সাড়ে তিন বর্ষে, ও হাতে খড়ি একেবারেই হয় নাই। তবুও মা লক্ষ্মী এবং সরস্বতীর রূপায় কখন বঞ্চিত নহেন।

আমার জ্যেষ্ঠমাতা ৬কুলস্বন্দরী দেবী গ্রামের ভিতরে সর্বদাংশে পূর্ণমাত্রায় গৃহিণী ছিলেন। তাঁহার কার্যদক্ষতার গুণে গ্রামান্তর হইতে ভক্তলোক আসিয়া বিবাহ ব্যাপারে ভোজ ফলাহার সামাজিকতায় কত লোকের নিমন্ত্রণে কি কি দ্রব্যের প্রয়োজন এবং কি প্রকারে আয়োজন করিতে হইবে সব জানিয়া বাইত। তিনি রন্ধনে দ্রোণদী, পাঁচ সাত শত নিমন্ত্রিত ব্যক্তির ভোজ অনায়াসে রন্ধন ও পরিবেশন করিতে পারিতেন, তাহাতে তাঁহার দ্বৌত বস্ত্রে একটু মাত্র মলিনতার চিহ্ন পরিলক্ষিত হইত না। ব্রাহ্মণ ভোজনের পূর্বে কখন জলগ্রহণ করিতেন না ও সে দীর্ঘ উপবাসে তাঁহার দেহ মনে কিছুমাত্র ক্লেশ বোধ হইত না, অতি পরিতোষ পূর্বক সকলকে ভোজন করাইয়া শ্রম সার্থক জ্ঞানে পরিতৃপ্ত ও চরিতার্থ হইতেন। ব্রত নিয়ম পূজা আত্মিক নিত্যকর্ম ছিল, দানে মুক্ত হস্ত, কত অনাথা বিধবাকে গোপনে প্রতিপালন করিতেন। কতদিন নিজ আহারীয় অন্ন



ব্যঞ্জন দ্বীন দুঃখীকে খাইতে দিয়া হাস্যমুখে অমনি থাকিয়া বাইতেন। গ্রামের নিরাশ্রয়ের রোগ শয্যার পার্শ্বে বসিয়া সেবা শুশ্রূষায় আত্মোৎসর্গ করিয়া দিতেন তাহাতে কখন ক্লান্তি ছিল না। গোরবর্ণা সবল দীর্ঘকায়, নীরোগ শরীর আদর্শ সাদ্ধী নারী, সর্বত্র পূজনীয়া ছিলেন। “নবকুমারের মাকে” না চিনিতেন এমন লোক ও প্রদেশে ছিল না। সহসা অসময়ে একদিন হঠাৎ মৃত্যু আসিয়া দেখা দিল। তাঁহার রোগের সংবাদ চতুর্দিকে প্রচার হইবামাত্র কত লোকজন কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়া বাড়ী ঘিরিয়া ফেলিল। দুর্গা পূজার উৎসব মধ্যে সহসা একদিনে তুলসী তলায় নামামৃত শ্রবণ করিতে করিতে সৌভাগ্যবতী পতি পুত্র কন্যা ও অপরাপর আত্মীয়স্বজন সব রাখিগা স্বর্গারোহণ করিলেন। তাঁহার অকাল মৃত্যুশোকে মাতৃহারা হরিপুর চিরতরে রোদন সার করিল। তাঁহার অভাবের শূন্যতার শ্রীহীন বড় তরফের অঙ্ককার আর দূর হয় নাই। জীবনে সেই প্রথম মৃত্যুর করাল ছায়া আমার বালিকা হৃদয় অঙ্ককার করিয়া ফেলিল। জ্যোতিমাতার বুদ্ধা জননীর সেই বিলাপ ধ্বনি আজিও যেন গভীর নিশীথে প্রাণের মধ্যে প্রতিধ্বনিত শুনিতে পাই। সে যে কি উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন রব ও সর্বজন ব্যাকুলিত কাতরতা, বাক্যে তাহা বুঝাইতে পারি না। সম্ভান বিয়োগ বিধুরা মাতা ভিন্ন কে বুঝিবে আর ? ভাষায় প্রকাশ করিবার সাধ্য এ জগতে আমার কিছা অল্প কাহারো নাই। কন্টার অকাল মৃত্যু শোকে পুণ্যবতী তপস্বিনী “আইমা” তিন মাস মাত্র জীবিত ছিলেন।

আমাদিগের দেশে পুত্র কন্যা স্বামী বিদ্যমানে মৃত্যু হইলে শ্মশানে লাল ধ্বজা উড়াইয়া তাঁহার সৌভাগ্য জ্ঞাপন করা নিয়ম ও নতন শূর্ণোপরি নব-ধাত্ত, অলঙ্ক, সিন্দূর, রক্তাশ্বর ও হস্তের লৌহশঙ্খ সধবার চিহ্নরূপ রক্ষিত হয়। জ্যোতিমাতার সেই সকল নিদর্শন বহু দিবস শ্মশানে অমনি ছিল এবং প্রবাস প্রত্যাগত আত্মীয় স্বজন তাহা দেখিয়া শোকাশ্র বর্ষণ করিতেন। আমরা বাহা হারাই তাহা কখনই কিরাইয়া পাই না, যিনি চলিয়া যান তাঁহারও স্থান চির অপূর্ণ রহিয়া যায়।

মৃত্যুর ছায় বিপদ এ জগতে অল্প কিছুই নহে, বতই আমরা ধৈর্য্যাবলম্বন করি না কেন, শোক সহ্য করিয়া থাকিতে পারা অতীব কঠিন। জ্যোতিমাতার লোকান্তর গমনের কষ্টে এবং অনিয়মে আমার তৃতীয় ভ্রাতার অপূর্ণকালে অষ্টম মাসে জন্ম হয়। মাসের এ অপূর্ণতায় তাহার তখন কোন ক্ষতি হয় নাই, নাম দেবেন্দ্রনাথ রাখা হইয়াছিল। বালক সুস্থ সবল সুন্দর ও অসাধারণ তীক্ষ্ণ বুদ্ধিশালী এবং মেধাবী ছিল। এক বৎসর মাত্র বিদ্যালয়ে ভর্তি হইয়া তিনবার প্রমোশন পায় ও অপূর্ব প্রতিভা-গুণে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া ষশোহর স্কুলে গৌরবাধিত ও নিয়ন্ত্রণের সর্বোপরি হইয়া বহুতর পারিতোষিক পাইয়াছিল।

জ্যেষ্ঠমাতার মৃত্যুর কয়েক মাস পরেই অর্দ্ধোদয় যোগ এবং মাঘ মাসের নীচ উপেক্ষা করিয়া আমাদিগের গ্রামের এবং পার্শ্ববর্তী স্থান সমূহের আবালবৃদ্ধ বণিতা পুণ্য স্নানে কানসাট মূরশিধাবাদের সন্নিকট চলিয়া যান। আমার পিতৃ-বসারাগে এ মহাযোগে বাইবার জন্ম ব্যাধা করিয়াছিলেন এবং তখন জ্যেষ্ঠমাতার পুত্র কন্তা মাতৃহীন “কালীপ্রসন্ন দাদা” ও তাঁহার কনিষ্ঠা ভগ্নী “স্বর্ণ দ্বিধি” তাঁহাদের সঙ্গ ধরিয়া মোক্ষ স্নানের সহযাত্রী হইয়া নৌকারোহণ করেন। দাদা দ্বিধির গমন দেখিয়া আমিও উৎসাহভরে তাঁহাদিগের সঙ্গী হই ও প্রথমে লোকারণ্যের কোলাহল মধ্যে মা ভাই ছাড়িয়া দূরে বাইবার কষ্ট তেমন অনুভব করিতে পারি নাট, তাহার পর যেমন শত শত তরণী অসংখ্য যাত্রীসহ কলরবে দিগদিগন্তর চমকিত কম্পিত এবং হরিশ্রবণ করিতে করিতে নদীবক্ষ খালি করিয়া চলিয়া বাইতে লাগিল দেখিলাম, আমিও এমনি মাতার নিকট ফিরিয়া বাইবার জন্ম কারার স্তর ধরিয়া দিলাম। অনেকক্ষণ কাঁদিয়া কাঁদিয়া ক্লান্ত ভাবে ঘুমাইয়া পড়িলাম। সায়াহ্নে যখন আবার নিদ্রাভঙ্গ হইল তখন অন্তঃস্বামী স্মর্য্যকরে নদ-নদী প্রান্তর এবং আকাশের অতীতপূর্ব সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিয়া ও কুলার প্রত্যাগত বিহঙ্গমের মধুর সঙ্গীত, রাখালগণের গাভীসহ গোষ্ঠাভিমুখে প্রত্যাবর্তনের আনন্দধ্বনি শ্রবণে মনে কতক শান্তিলাভ করিলাম। ক্রমে চারিদিক নিস্তব্ধ হইয়া আসিতে লাগিল, প্রাণী রাজ্য নীরবে পৃথ্বীসহ যেন বিশ্বপতির ধ্যানে আত্মবিস্মৃত হইয়া গেল। কেবল দূরে ও নিকটে নৌকাবহার ঝুপঝাপ শব্দ তালে তালে কর্ণে আসিয়া জীবনের পরিচয় দিতেছিল যাত্র। প্রাণের ভিতর একটা অনিশ্চিত আশঙ্কায় কেমন বেদনামুভব হইতে লাগিল অথচ ভবিষ্যৎ ভাবিবার শক্তি কিছু ছিল না।

মা ও ভাইদিগকে ছাড়িয়া অজ্ঞাত দূরদেশে গঙ্গাস্নানের জন্ম ব্যাধার অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে অতিশয় বিষন্নতা আনয়ন করিয়াছিল। মাতৃহীন দাদা দ্বিধির স্নেহ মমতার দিবসে বতাই কেন চুপচাপ থাকি না, রাত্রে চোখের জলে উপাধান ভিজিয়া বাইত। দাদা দ্বিধি তাহা লক্ষ্য করিয়া আমাকে সান্ত্বনা দিতেন। দ্বিধি একাদশ বর্ষীয়া বালিকা, “স্বর্ণময়ী” ত স্বর্ণময়ী, ত্র্যবীভূত স্বর্ণর্ণে গড়া মনোহর মানসী প্রতিমা। “ভাসা ভাসা খাসা চোখ তুলি দিয়া ঝাঁকা, তার উপরে কিবা শোভা ভ্রমুগ বাকা”। কুঞ্চিত দীর্ঘ কেশ কলাপ সেই স্নানর মুখের দ্বিগুণ সৌন্দর্য্য বাড়াইয়াছিল। প্রান্তরে ক্ষুদ্রিয়া যেন ভাস্কর সে কন্টারঙ্গ গড়াইয়াছিল। তিনি এমনি ভক্তিমতী ও ধর্ম্মপরায়ণা ছিলেন যে দেবতার পায় পুষ্পাঞ্জলি না দিয়া সেই পুণ্যর বৎসরের বালিকা কদাপি জল গ্রহণ করিতেন না। তাঁহার অন্তর দ্বারাতে ত্র্যবীভূত ছিল, দাস-দাসীকে বকিতে শুনিতে ককণাময়ী দ্বিধি কাঁদিয়া ফেলিতেন ও বলিদানের রক্ত দেখিলে মূর্ছাগত হইতেন। চতুর্দশবর্ষীয় কালী-প্রসন্ন দাদার পরিচয় ত পূর্বেই দিয়াছি। কিশোর বালক “বাহুলের” স্তায় বীরা

প্রকৃতি ও উন্নত চরিত্র গুণে সর্বজন প্রিয় ছিলেন।

প্রথম দিন কানসাট পুতুরের গঙ্গাতীরে বাজীর নৌকার সারি লাগিয়া গেল। অসংখ্য পানসী, অগণিত মল্লয় ও চারি পার্শ্বে দোকান পাট, হাট বাজার বসিয়া এক অপূর্ণ শ্রীধারণ করিল। বাহুমন্ডে বেন সাহারার মক্কায়ে মায়া রাজ্য সৃষ্টি হইল। পূর্বের সেই জনশ্রুত সৈকতে, বালুকামণ্ডরে ভক্ত বাজীগণ মহানন্দে বিরাজ করিতে লাগিলেন। “কানাট” (তাম্বু) ফেলিয়া, বগ্ননগরীতে কেহ তিনদিন কেহবা গুণ্ডাহ কাল গঙ্গাবাসের আয়োজনে ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। কলনাদিনী ভাগীরথী এই জন কোলাহলের সহিত ঐক্যতানে যোগ দিয়া উচ্ছ্বসিত ভাবে আত্মমহিমা কীর্তন করিতে করিতে পুণ্য স্নানের জন্ত বেন সবাইকে আহ্বান করিতেছিলেন। আমরা ছোট ছোট বালক বালিকারা উৎসাহভরে তাহাতে তাহুতে ঘুরিয়া সব দেখিতে লাগিলাম। অধিকাংশই নারী, পুরুষের সংখ্যা ততোধিক নহে। সে যে কি উৎসাহ, কি ভক্তি, কি আনন্দ কলরব যিনি স্বচক্ষে তাহা দর্শন ও শ্রবণ করেন নাই তাঁহাকে বুঝাইতে পারা শক্ত।

দ্বিতীয় দিন যোগের মোক্ষ আন। চারিদিক রাজি থাকিতে চতুর্দিক মূখরিত করিয়া সেই সংখ্যাতীত বাজীর দল, নর নারী, যুবক যুবক, বালক বালিকা জাহ্নবীতট ঘিরিয়া ফেলিলেন। সকলের মুখেই “মাতঃ শৈল স্তুতে” ধ্বনি। পতিতপাবনী ভাগীরথীও সেই দিন পুণ্য স্নানে বিশ্বসংসারকে মুক্তিপথে লইয়া বাইবার জন্ত বেন মনে মনে প্রয়াসী ছিলেন। মাহুয়ের ইচ্ছা, ভগবানের নিষ্পত্তি। আমরা সম্পূর্ণ নিরুপায়, নির্ভর তাঁহারই উপর এই সার সত্য।

স্নান দান হরি সঙ্কীর্তন ও মহাসমারোহে গঙ্গা পূজা চলিতে লাগিল। “স্বর্ণ-দিদি” পিসিমাতাদিগের সহিত সমানরূপে সব করিয়া অনশনে থাকিয়া রাজি শেষে হঠাৎ দারুণ সংক্রামক রোগাক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। ডাক্তার বৈজ্ঞানিক নাই চিকিৎসা হইল না। অকালে অসময়ে প্রবাসে পরিবারের বন্ধ খালি করিয়া অতি প্রত্যুষে অনিন্দিত স্বর্ণকুহুম জাহ্নবী তীরে ঝরিয়া পড়িলেন। এই অভাবনীয় বিপদে পিসিমাতারা শোকে একেবারে বাহুজ্ঞান হারাইয়া বালুচরে পড়িয়া হাহাকার করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের আর্ন্তনাদে আকাশ পাতাল কম্পিত হইয়া উঠিল। কে কাহাকে সাহায্য দেয়? সবাই নিজের পুত্রকন্ডা লইয়া বিব্রত এবং দেখিতে দেখিতে সেই জন কোলাহল থামিয়া গেল ও চারিদিকে ছত্রভঙ্গ হইয়া সকলে পালাইয়া বাইতে লাগিল। সেই এক দিনের মধ্যেই মহামারী সর্বগ্রাসী সংহার মূর্তি ধরিয়া বাজীগণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিয়া চলিল।

আমাদিগের নৌকার আগেই সেই কালরোগ দেখা দিয়াছিল এবং আবার কালীপ্রসন্ন দাদাকে রাজ্যে আক্রমণ করিল ও প্রভাত হইবার পূর্বেই তিনিও সকলের জন্মে নিদারুণ শোক শেল বিধ করিয়া বীর বালক দিব্যধামে চলিয়া

গেলেন। এই অকাল মৃত্যুশোকে পিসিমাতারা ত পাগল হইয়া অনাহারে অনিদ্রায় অবিশ্রান্ত চিৎকার ও রোদন ধনিতে শয্যাগত হইয়া রহিলেন এবং এ সংবাদ বায়ুবেগে নাটোর রাজধানীতে আমার জ্যাঠামহাশয়ের কর্ণগোচর হইল। তিনি অল্পক্ষণ ত্যাগ করিয়া শয্যা আশ্রয় করিলেন। পিতৃদেবের নিকট বনগ্রামে (পূর্বে নদীয়া জেলা, এক্ষণে বশোহর) তাড়িতযোগে এ বার্তা পৌছিল। তিনি ভ্রাতৃপুত্র শোকে রাজকর্ষ ছাড়িয়া নিতান্ত অভিভূত হইয়া পড়িলেন। এই দুর্ঘটনায় জ্যেষ্ঠভাতের বংশ প্রায় লোপ হইল। তাহার একমাত্র পুত্র জ্যেষ্ঠ নবকুমার চৌধুরী ঠাকুরদাদা মহাশয় তখন একা জীবিত ছিলেন। এক্ষণে দাদার পুত্র শ্রীমান হুম্মিলকুমার ও তাহার সম্ভানগণ বংশে বর্তমান।

সেই অর্দ্ধোদয় যোগে আমাদের পরিবারে ছোট দাদা, দ্বিদি, ৬হরকান্ত চৌধুরী ছোট কাকা মহাশয় ও এক ভগিনীপতি বিপিন লাহিড়ী, অকালে পরলোকগত হইলেন। অনেক লোকই মারা গেল কিন্তু ইহারাই প্রধান। আত্মীয় কুটুম্ব জ্ঞাতিবর্গ দাসদাসী এবং নৌকার মাঝি মাল্লা কত যে মারা পড়িল তাহা এখন বলা কঠিন। ধরিতে গেলে গ্রাম মহামারীতে উজার হইয়া গিয়াছিল এবং যখন গঙ্গাযাত্রীর নৌকা সব ফিরিয়া বড়াল নদীর তীরলগ্ন হইল তখনকার সে বিলাপ ও করুণ ক্রন্দন রবে গ্রামের চিরশাস্তি ভঙ্গ হইয়া গেল। পুত্র শোকাভুরা জননীর হাহাকার, বালবিধবার ভগ্নহৃদয়ের উচ্চ রোদন ধনি এবং সর্বজনীন শোকের সে আর্ন্তনাদ ভাষায় প্রকাশ করা সাধ্যাতীত। সে অতীত যুগের দুঃখ কথা আজও কখন উঠিলে অন্তর বিদীর্ণ হইয়া চক্ষু জলে ভরিয়া যায়, তাহা আর বলিব কিরূপে? সেই দারুণ শোকের আঘাত সহ্য করিতে না পারিয়া আমার বড় পিসিমাতা ৬করুণাময়ী দেবীও সেই বৎসরই গঙ্গাপ্রাপ্ত হন। এইরূপ এক এক পুণ্যযোগে বঙ্গমাতার বহু সম্ভান সম্ভতি ইহলোক হইতে চলিয়া বাইয়া গ্রাম নগর শূন্যময় করিয়া থাকেন, তথাপি ধর্ম্মাঙ্ক গভীর বিশ্বাসী হিন্দুগণ আজীবন ভাগীরথী স্নানের স্বেযোগ কখন ত্যাগ করেন না এবং মুক্তি লাভার্থে সকল বিপদ অতিক্রম করিয়া লোকান্তরের মোক্ষ সক্ষম করেন। যথেষ্ট কি অটল বিশ্বাস।

প্রকৃতির নিয়মানুসারে শোক দুঃখের ঝড় ক্রমশঃ প্রশমিত হইলে পিতৃঠাকুর প্রবাসে আর একা থাকিতে না পারিয়া আমাদের কণ্ঠস্থান বনগ্রামে লইয়া বাইবার বন্দোবস্ত করিলেন। শুভদিন তিথি নক্ষত্র দেখিয়া আমাদের যাত্রা স্থির হইয়া গাড়ী পাখী লোকজন সব প্রস্তুত হইলে আমরা বাল্যের স্মৃতি নিকেতন, ক্রীড়া সঙ্গী এবং সর্বাপেক্ষা প্রিয়তর পিতৃমহাদেবকে ছাড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে রওনা হইলাম। তৎকালে কুঠিয়া রেলগাড়ী উঠিয়া চক্রবর্তী (চাক্কা) নামিয়া পাখীযোগে বনগ্রাম বাইতে হইত। আমাদেরও তাহাই করা হইল। তখন পর্য্যন্ত আমরা ইংরাজ জাতির কাহাকেও কখন চক্ষে দেখি নাই। পরিণামে সুসজ্জিত নতুন টেন, চারিটিকে কল কারখানা এবং সর্বাপেক্ষা আশ্চর্যজনক দৃষ্ট দ্রব্য

নরনারী। দেখিয়া একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেলাম। বেশভূষা চলন ধরণ ও ভাষা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, দেখিয়া অনিয়া মনে মনে ভয়েরও সঞ্চার হইল। মনোপার্ককে স্তম্ভিতরূপে নিরীক্ষণ করিয়া কান্না রমণীগণ যেমন অবাক হইয়াছিল আমাদিগেরও সেইরূপ অবস্থা ঘটিল। এমন শ্বেতবর্ণ মানব কোন্‌ রাজ্যের ও যদি তাহাদের দেশে আমাদের কখন লইয়া যায় তাহা হইলে সে অজ্ঞাত রাজ্য হঠাৎ আর কিরিবার কোনই উপায় নাই, “সাত সমুদ্র তের নদী পার” হইয়া যাওয়া আসা কত অসম্ভব কার্য; আশু কেবল তাহাই বলিয়া একটু ঘেঁষিয়া ঘেঁষিয়া মায়ের পার্শ্বে রহিয়া গেল, অন্য কিছু দেখিবার জন্ম উঠিল না। যোগেশ, দেবেন্দ্র তখন বড় ছোট, ছেলেধরার ভয়ে দাসীর ক্রোড়ে নীরবে ভীতভাবে বসিয়া রহিল। আমার অন্তরেও খুব ভয় হইয়াছিল, তবে “দিদি” বলিয়া মুখে কিছু প্রকাশ করি নাই। মেম, সাহেব কি, ও কোন্‌ দেশীয়, কে ইহারা, চাকর দাসীরা তাহাদের “সাহেব সাহেবানী” নাম করণ করিয়া দিল, নিতান্ত অনভিজ্ঞ আমরা। তাহাই বলিতে লাগিলাম।

আমার মাতামহকুলে কেবলমাত্র মায়ের এক “দাদি” (দিদি) চতুর্দশ বর্ষের বালবিধবা—আমাদিগের মাসীমাতা ৬দ্রবময়ী দেবী ছিলেন এবং এ বিদেশ বাসের তিনিই মাতার সঙ্গিনী এবং অভিভাবিকা স্বরূপ সঙ্গে আসিয়াছিলেন। মাতৃঘনা চির ব্রহ্মচারিণী, আজন্মকাল পরসেবায় আত্মোৎসর্গ করিয়া একাহারে পূজা আফিকে জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন। “আচরণ বিলম্বিত দীর্ঘ কেশরাশি” কাটিয়া মুণ্ডিত মস্তকে সে কালের “ঠেটি” ছোট মোটা ধূতি পরিয়া থাকিতেন ও অতি প্রত্যাষে শত সহস্র ঠাকুর দেবতার নাম করিতে করিতে শয্যা ত্যাগ করিয়া গৃহ কার্যে রত হইতেন। রন্ধনে সিদ্ধ হস্ত, এমন স্বাস্থ্য মিঠাই মোণ্ডা ও অন্ন ব্যঞ্জন কেহ প্রস্তুত করিতে পরিতেন না এবং ধনী দরিদ্রকে সমানভাবে পরিতোষ পূর্বক আহাৰ করাইয়া কৃতার্থ জ্ঞান করিতেন। “পৈতাকাটী” স্বজনাই শিলাই, বিবিধ নারিকেলের মিষ্টান্ন ফুল ফল “চিড়া জিরা” প্রভৃতি একরূপ স্বন্দর তৈয়ারি করিতে জানিতেন যে তিনি কোন কুটুম্বিতায়, বিবাহ, উপনয়ন কিম্বা অন্নপ্রাশনের নিমন্ত্রণে সর্বাগ্রে আত্মীয়স্বজন তাঁহাকেই লইয়া বাইতেন। তাঁহার নিকট “বহুধৈব কুটুম্বকং” ছিল। দাস দাসীর রোগ শয্যার পার্শ্বেও বসিয়া অবিশ্রান্ত সেবায় কত দিন যে অনাহারে গিয়াছে তাহা গণনা করিতে পারি না।

“সোণার প্রতিমা গড়ে বিধবা নারীর,  
রাখিতাম স্থানে স্থানে ভারত ভূমির।  
বিদেশের নরনারী এদেশে আসিত,  
পতিব্রতা প্রতিযুক্তি নয়নে হেরিত।

লিখিলাম নিরদেশে,                      কি স্বদেশে, কি বিদেশে,  
রমণী এমন আর ধরাতলে নাইরে।”

মালীমাতার সম্বন্ধে ইহা প্রত্যেক বিষয়ে বলিতে পারা যায়। তাঁহারই স্নেহ ক্রোড়ে লালিত পালিত হইয়াও তাঁহার হস্তের অন্ন ব্যঞ্জে আমরা এত বড় হইয়াছি। তিনি আমাদের মাতৃরূপিণী মালীমা। তাঁহার পরলোকগত আত্মার উদ্দেশ্যে নতশিরে বারবার প্রণাম করি। তিনি ইহলোকে দুঃখীর আশ্রয় ও আমাদের জননী ছিলেন, এক্ষণে লোকান্তরে সেই পুণ্যবলে অক্ষয় স্বর্গভোগ করিতেছেন এই আশা। তাঁহার জীবনের একমাত্র সাথ ছিল কালীঘাটের গঙ্গাতীরে মৃত্যু, যেখানে তাঁহার স্বামী খণ্ডরঠাকুর স্বর্গদেবী ও ভাস্কর মহাশয় দেহত্যাগ করিয়াছিলেন সেই স্মৃতিময় স্থানে তাঁহারও শেষ কার্য্য আমার ভ্রাতাগণ সম্পূর্ণ করিয়াছেন। বিশেষতঃ, স্বহস্ত, পুত্রবৎ স্বন্ধে বহন করিয়া গঙ্গাঘাটে লইয়া স্বয়ং অস্ত্যেষ্টিক্রিয়া সামাধা করিয়াছিল, গঙ্গাতে পিণ্ডদানও হইয়া গিয়াছে।

বনগ্রামে আমাদের রীতিমতন লেখাপড়া আরম্ভ হইল। পিতৃদেব স্বয়ং গুরু ও আমরা সব শিষ্য। প্রাতে স্কুল বলিত, সায়াহ্নে পড়া দিতে হইত এবং তীক্ষ্ণবুদ্ধিশীল আশু সর্বোপরি থাকায় আমরা একটু ভীত থাকিতাম। পড়া দিবার ঐ সময় প্রায়ই মা আমার বেণীবন্ধন করিতেন ও রচনার কাক্ষিকার্থে বিলম্ব হইয়া বাইত। সেকালের খোপার নাম “জিলাপী পাক, মোড়া এবং বিবিয়ানা”। কপালের ও কাণের পার্শ্বের চূণিত কুস্তলের বেণীর পরিপাট্যে দেয়ী হইবার কথা ও তাহাতে আশুর নিকট আমার পড়া দেওয়ার ব্যবস্থা হইত। সেটা দণ্ডস্বরূপ মনে করিয়া আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইতাম। ছোট ভাইএর গুরুগিরি আমার ভাল লাগিত না, চক্ষের জলে সমস্ত বস্ত্র ভিজিয়া বাইত, রাজ্যে আহার প্রায়ই হইত না, তথাপি পিতৃঠাকুরের কথার অবাদ্য হওয়া ও তাঁহাকে অমান্য করা সাধ্যাতীত। নীরবে আশুর মাষ্টারী মানিয়া লইতাম। গজ-পদ্ম ভূগোল ইতিহাস ও লোহারাম শিরোমণির ব্যাকরণ সকল বিষয়ে তাহার সমকক্ষ ছিলাম, কেবল অঙ্কে নীচে থাকিতাম ও পরে ত্রৈরাশিক পর্য্যন্ত উঠিয়া সেই খানেই বিদ্যা থামিয়া গেল। ইংরাজী তখনও পড়িতাম না। আশু স্কুলে ভর্তি হইয়া নিয়মমত অধ্যয়ন করিতে লাগিল। আমি গৃহের পাঠশালাই তেমন রহিয়া গেলাম।

সেইবার ৭১ কি ৭২ সনের আশ্বিন মাসের দুর্ভিক্ষ বাড়ির বৃত্তান্ত এখন আর তেমন স্মরণ নাই। সে বড় অসংখ্য লোক নৌকা ডুবিতে মারা যায়, ঘরবাড়ী বৃক্ষ সব কত যে লোকসান হইয়াছিল, তাহার কোন ঠিক হিসাব নাই। সম্মুখে দুর্গাপুজায় প্রবাসীরা মনের স্বখে পরিজনসহ নৌকাযোগে গৃহ প্রত্যাগত হইতেছিল, দারুণ বড় জলমগ্ন হইয়া সব গ্রাণ হারাইল, নৌকা ভাঙিয়া শবদেহ সকল বালুচরায় রহিয়া গেল, কাহারো জীবন আর রক্ষা হইল না। আমরা বনগ্রামের বাঙালা ঘরে থাকিয়া কোনরূপে বাঁচিয়া গিয়াছিলাম, আমাদের

মূল্যবান আসবাব সমূহ ও বাড়ী বাইবার দুই তিনখানা নৌকা পদ্মাগর্ভে অতল জলে নিমগ্ন হইয়া গিয়াছিল। ওনিয়াছি সেবারে নাটোর রাজের গুরুদেব “গৌসাইজি” জামাতা পুত্র ও আত্মীয় স্বজন সহকারে নৌকা ডুবিয়া মারা যান এবং অনেকেই সর্ববাস্ত হইয়া পথের ভিখারী হইয়াছিলেন। এমন প্রবল ঝড় সেকালের বুকেরাও নাকি দেখেন নাই। এক একটা যুগে এক এক দুর্ঘটনা এমনি হয় যে তাহা ইতিহাসের বক্ষে অঙ্কিত রহিয়া যায়। যেমন সাতাস্তরের মনসুরায় সোণার বাজালা ছারখার করিয়াছিল এও সেই প্রকার।

বংশ পরম্পরায় আমাদিগের গৃহের প্রথাহুসারে আমারও কুলীনপাত্রে বিবাহ হইয়াছিল। চিরন্তন পদ্ধতি সহসা তুলিয়া দিতে পারেন নাই। বড় তরফে তখন আমিই একমাত্র কন্যা, “স্বর্ণদিদার” প্রাপ্যটাও আমার অংশে পড়িয়াছিল। আমার পূর্ণ দশবর্ষ বয়স, বিবাহের জাঁক জমক সমারোহ দান ভোজ ফলাহার ও লোক লৌকিকতা আরব্য উপন্যাসের গল্পের ন্যায় অদ্ভুতপূর্ব। কুলীন পাত্রে কুলভঙ্গ করিবার নাম “করণ”। অধিকাংশ স্থানে ধনবানের কন্যা গরিব কুলীন পাত্রে বিবাহ দিবার পূর্বে আত্মীয় বন্ধু গুরু ও পুরোহিত সমভিব্যাহারে নদী কিংবা দীর্ঘিকার জলে হাড়ীতে চাউল তিল ইত্যাদি দিয়া কন্যাকর্তা ভাবী জামাতার সহিত তাহার কুল অতল জলে ডুবাষ্টয়া দেন। তাহার কুল নদী গর্ভে নিমগ্ন করা হয় তাহার দুঃখিত ও লজ্জিত হইবার কথা তবে ধনলোভী কুলীনগণ তাহা গ্রাহ্য করেন না এবং এই অসামঞ্জস্য বিবাহে ভবিষ্যতে অল্পখী হইয়াও থাকেন। এ প্রকারে কন্যাদানের অনিশ্চিত ফলাফল বংশমর্যাদা রক্ষার্থে পিতামাতাও মনে করেন না। সামাজিক নিয়ম হঠাৎ ভাঙিয়া দেওয়া ত বড় কঠিন। এখন আমাদের বংশেও এ প্রথা শিথিল হইয়া আসিয়াছে। বিবাহ পরে আবার আমরা বনগ্রামে আসিলাম, শশুরালয় বাওয়া সম্বন্ধে কোন কথা সে সময় উঠিল না, ভবিষ্যতে সে বিষয় স্থির হইবে শুনিলাম। সেই বৎসর বনগ্রামে ভ্রাতা কুমুদেব এবং ক্রমে প্রমথ, মন্থন সেনের এবং মৃণালিনীর জন্ম হয়। পিতৃদেব বশোহর বদলী হইয়া যান ও সেইখানে এই তিন জনের এবং প্রিয়রও জন্ম হইয়াছিল। ছয় ভ্রাতার বড় আমি, সেইজন্য আমার আদরটা অত্যন্ত বেশি মাত্রায় ছিল। তাহাতে লেখা পড়ায় কখন আমি অবহেলা করি নাই বরং জীবনের পরিবর্তন সহ আরো যত্ন ও মনোবোগ সহকারে তাহা করিতে লাগিলাম। পিতৃদেব সকল স্থানেই একটু নির্জ্ঞান স্থানে বাস করিতে পছন্দ করিতেন এবং আমরা ভাই বোনে একত্র খেলা ও পাঠাভ্যাস করিতাম, অল্প কাহারো সহিত মিশিতে পাইতাম না। আমাদের নিকট নিজের আত্মীয় বালক চারি পাঁচ জন থাকিত, তাহারাই ক্রীড়াসঙ্গী এবং সহপাঠী ছিল। বাল্য স্মৃতি মনুজ্য জীবনের একটা স্থখের সামগ্রী, সেদিনের কথা আজও হৃদয়ে কেমন আনন্দ আনয়ন করে।

ঈশ্বর গুপ্তের বংশধর এক বৈষ্ণবাজ সংস্কৃত শিক্ষা দিতেন। এই সব ভদ্র লোকের বাসে বাড়ীর নিয়তলাটা দিব্য গুলজার ছিল। কবিরাজ মহাশয় গীত বাজে সুপণ্ডিত ছিলেন, এবং সরস কথা বার্তার পিতার বড় প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন। হৃদয়দর্শী বালক আশু ছুঁচারি দিবসেই দ্বিতীয় শিক্ষকের বিত্তাবৃদ্ধির মঞ্চটা বেশ বুঝিয়া লইয়াছিল। তাঁহার হস্তজনক কোতুকাবহ বাক্যলাপে ও আশ্চর্যবিশ্বত ভাব দর্শনে তিনি যে একজন বিলক্ষণ পুষ্পগন্ধ বিশিষ্ট (Fool) তাহা প্রতীয়মান হওয়ার গৃহের অন্তান্ত বালকদিগের নিকটে ক্রীড়া পুত্তলিকাব্যং হইয়া উঠিলেন এবং ক্রমশঃ বিত্তালয়ে দ্বিতীয় শিক্ষক তলাপাত্র মহাশয় “পাগলা মাষ্টার” “ক্যাপা সার” নামে অভিহিত হইয়া বড় গোল করিতে লাগিলেন। আশু ভিন্ন সমগ্র ছাত্রবৃন্দ তাঁহার প্রতিকূলে দাঁড়াইয়া কর্তৃপক্ষের নিকটে তাঁহার নিত্য কার্যের অত্যাচার বিবরণ দিয়া রিপোর্ট করিল। সেই রিপোর্টের সার কথা, অকারণ “ছেলে প্রহার ও অসাধারণ রাগী মাষ্টার”। তাহাতে মহা আন্দোলন বিপাকে “আদাড়ে Sir কে” কার্যত্যাগ করিতে হইল। তাহার পর আদালতের উকীল, মক্কেলের সহিতও বনাইতে না পারিয়া মুন্সেফ হইলেন এবং পরিশেষে মহাপ্রস্থান করিলেন।

ক্রমে আমাদের গৃহ শিক্ষকের পদ পিতৃদেব স্বয়ং আবার গ্রহণ করিয়া অতি পরিশ্রমসহ রাজি দিন আশুকে স্কুলের পাঠ্য পুস্তক বাদে অন্তসব সাহিত্য ইতিহাস পড়াইতে লাগিলেন ও তাহার ক্রত উন্নতি দেখিয়া স্কুলে “ডবল প্রমোশান” হইতে লাগিল। তখন বোল বৎসরে প্রবেশিকা পরীক্ষার নিয়ম ছিল। সেই জন্ত তাহাকে তিনবৎসর বসিয়া থাকিতে হয়। সেই কয়েক বৎসর মধ্যে আশু অনেক পড়িয়া অনেক শিখিয়া একটা বিজ্ঞবালক হইয়া উঠিল। “বয়সে কি বিজ্ঞ হয় বিজ্ঞ হয় জানে” একাক্য তাহার পক্ষে খাটিয়াছিল।

আমার জন্ত এবার পৃথক বন্দোবস্ত হইয়াছিল। এক ফিরিজী যেম নিযুক্ত হইয়া ইংরাজী ও শিল্প কার্য শিক্ষা দিতে আসিলেন। তাঁহাকে বাড়ীর লোকে “ববের মা” বলিয়া ডাকিতেন, যেমন দেশের পদ্ধতি, পুত্র কন্যা বড় হইলে মেয়েরা মাতৃপদ লাভে তাহাদের নামে কথিত হইয়া থাকে, এও সেই প্রকার। শিক্ষয়িত্রীর সাহায্যে লেখা পড়া হটুক আর নাই হটুক বিদেশী ফ্যানসিটা বেশ আয়ত্ত হইয়া গেল। পূর্ণমাত্রায় অল্পকরণ করিতে ছাড়ি নাই, এখন তাহা নিজেই স্মরণ করিয়া নিত্যন্ত লজ্জিত ও কুণ্ঠিত হইয়া থাকি। “ববের মা” রোম্যান ক্যাথলিক, তাঁহার উত্তেজনায় আমরা সকলে মিলিয়া একদিন চার্চে বাইয়া উপস্থিত হইলাম, আমাদের সম্মানার্থে সে দিন বাজালায় বক্তৃতা হইল। সেরূপ অপূর্ব উচ্চারণ ও অভূত বক্তৃতা জীবনে কখন শুনি নাই। পাদরী মহোদয় ভাব ভঙ্গী সহকারে বলিতে লাগিলেন, “জাক জানানাগণ, সয়টান ডারের লিকটে, প্রভুর প্রেরণ, টাঁহার চর্ম টোমরা লইবে কিনা বোলো ?



স্ট্রট বেমন আঙনে গলে যায় টেমনি টোমরা নরকে গলে যাবে, লয়টান চুলে ঢরিয়া বেটমিকে লয়ে যাবে, গরম লোহা ডিবে।” এই হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা শ্রবণে, বুন, বাগদী ভক্তগণ একেবারে ক্রন্দনে কল্লোলে ধর্মমন্দির প্রাবিত ও কণ্ঠিত করিতে লাগিল। আমরাও উপদেশের উচ্ছ্বসিত ভাবায় এবং বক্তৃতার উৎসাহে কোনরূপে হস্ত সঞ্চরণ করিয়া উত্তেজনায় তপ্ত হুতের স্রায় গলিয়া গৃহে বাইয়া জমাট বাঁধিয়া গেলাম। “লয়টান চুলে ঢরিয়া” আজিও “নরকে” লইতে পারে নাই।

আমাদিগের এই ভজনালয়ে গমনবার্তা যশোহরময় রাষ্ট্র হইয়া মহা হৈঃ চৈঃ পড়িয়া গেল এবং দলবদ্ধ ভক্তলোক সব ইহার সারতত্ত্ব জানিতে আসিতে লাগিলেন। আমরা খ্রীষ্টধর্ম কখন গ্রহণ করিব না ও করিতে পারি না সে জ্ঞাত গির্জায় বাই নাই বলিয়া তাঁহাদের বিদায় করা হইল। “Save me from my friends” বধন অবস্থা তখন দুর্দান্ত মনরো সাহেব ম্যাজিষ্ট্রেট ( পরে পুলিশের সর্বোপরি হর্তা কর্তা বিধাতা ) পিতাঠাকুরকে পত্র দ্বারা সাধরে আহ্বান করিয়া রোমান ক্যাথলিক ধর্মগ্রহণ করা যে অত্যন্ত অস্বাভাবিক কার্য সে বিষয় অনেক উপদেশ দিলেন। হিতে বিপরীত ঘটিল, অগত্যা বেচারি “ববের মাকে” অকালে বিদায় করিতে বাধ্য হইলেন। আমরা খ্রীষ্টান মেমের হস্ত হইতে রক্ষা পাইলাম দেখিয়া অস্বাভাবিক হিতার্থী বন্ধুগণ যেন শান্তিলাভ করিলেন। তাহার পরও অনেক মিশনারী মেম আমার শিক্ষয়িত্রী হইয়াছিলেন। পিতৃদেব অবসর দিনে বালকদিগকে সঙ্গে লইয়া শীকারে যাইতেন। বড় বড় বুল কুকুর সহচর, “মেরী হান্টার” প্রভৃতি বোটক বাহক, সে সময়ে ভ্রাতাগণের উৎসাহ দেখিয়া আমিও যে কখন তাহাদিগের সঙ্গী হইতে চাহিতাম না এমন কথা বলিতে পারি না, দূরে দূরে থাকিয়া দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিতাম। এই শীকারের অগ্রগণ্য দলপতি বালক কুমুদ। স্থান অস্থান বোধ ছিল না, গুলিবিদ্ধ শিয়াল তাড়াইয়া তাহার পশ্চাৎ গর্তে প্রবেশ করিত এবং কখন কখন সর্বদিকে কর্দ্দম মাখিয়া শতধাছিন্ন বস্ত্রে শোণিতসিক্ত হইয়া মৃত শৃগালকে টানিয়া বাহিরে আনিত। তীর ধনুক তাহার নৃত্য ক্রীড়ার বস্ত্র ছিল ; বাঁটুল প্রস্তুত মাও করিয়া দিতেন। ডুডু, ব্যাটবল খেলা, লক্ষ এবং সঞ্চরণ এই সকল পুরুষোচিত খেলায় পিতৃদেব সমানরূপে যোগ দিতেন, আবার তাস পাশাও মধ্যে মধ্যে চলিত, জয় পরাজয়ে মহোৎসব পড়িয়া বাইত। আমি বিভ্রাটলয়ে অধ্যয়ন করিতে কখন বাই নাই, পারদর্শিতার প্রস্কার কি কোন সন্দেহ কদাপি ভাগ্যে মিলেও নাই। তবে “প্রাইজ” বাহা পাইয়াছি তাহাও আবার অল্প কাহারো কপালে বাটিয়াছে কি না জানিনা। পিতৃ বন্ধু পূজ্যপাদ দীনবৎসল স্নেহশীল বিভ্রাটগর মহাশয় আমার কবিতা আবৃত্তি শুনিয়া অতিশয় স্নেহবিগলিত অন্তরে স্বহস্তে তাহার বাবতীয় পুস্তক উপহার দিয়াছিলেন। বান্ধবপ্রবর ৬দীনবন্ধু বাবু কৈশোর জীবন পিতৃস্নেহে

অভিযুক্ত করিয়া কত পুষ্টক, কত দৌধীন দ্রব্য, কত ক্রীড়া-সামগ্রী দিয়াছিলেন তাহার স্মৃতি ও কতক নিদর্শন অত্য়পি বিদ্যমান আছে।

প্রতি শনি রবিবারে আমাদের গৃহে সাহিত্যাহুরাগী বন্ধুগণের আসর জমিত, কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের “সম্ভাব্য শতক” হইতে আরম্ভ করিয়া “ব্রজাঙ্গনা বীরাদনা মৃণালিনী” নবীনের নবজাত “অবকাশ রঞ্জিনী” প্রভৃতির আলোচনা ও আবৃত্তি চলিত। এই মজলিসের প্রধান ছিলেন রসজ্ঞ দীনবন্ধু মিত্র মহাশয়। বটতলার “কি মজার শনিবার”ও এখানে বাদ বাইত না। সে সব অশ্রুতপূর্ব ছড়া আজকাল শুনিতে পাই না। যেমন “গন্ধা যে ডাটি রিভার হয় সে ফিভার, সে জলে আর কেউ নেওনা,—একটা পুতুল গড়ে মস্ত পড়ে ফুল দিয়া আর ফুল (fool) হয়োনা”। আবার চাহুরী সম্ভ্রান্তদয় কেরাগীর কবিতা, “অস্থখী ভীষক মস্তপ অতি, অস্থখী রূপসী বিধবা সতী—অস্থখী যেজন যৌবনে জরা, অস্থখের শেষ চাহুরী করা”। বাহির বৈঠকখানায় যখন বাগ্বেদীর বাণী ও বীণা বাক্সারে দর্শক এবং শ্রোতৃবর্গ বিমুগ্ধ ও উৎফুল্ল, তৎকালে অন্তঃপুরে লক্ষ্মী সহায় অন্নপূর্ণার রন্ধনস্থালী বিবিধ মিষ্টার ও স্ব্যাদ অন্নব্যঞ্জন পরিপূর্ণ হইয়া উঠিত—মা ও মাসীমা নিজেরাই অক্লান্ত শ্রমসহ স্বহস্তে সকল প্রস্তুত করিতেন। আমরা ভাই বোনো মিলিয়া দুইদিকের রসাস্বাদনের আনন্দে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতাম। অন্তরে সব পরিবেশন শেষ হইলে আহারের জন্ত বন্ধুগণ একত্র প্রীতি ভোজনে বসিতেন। সে সময়ে হাত্তোচ্ছাস ও আমোদজনক গল্পের লহরী বহিয়া বাইত। মিত্রজা এক একটা সরস গল্প বলিতেন আর চতুর্দিক হইতে উচ্চ হাস্যধ্বনিতে গৃহ কম্পিত হইয়া উঠিত। ইহার মধ্যেও ভোজনের কোনদিকে কোনরূপ শৈথিল্য দেখা বাইত না। মাংসের গরম চপ্ পাতে পড়িবামাত্র উষ্টার সস্ (Worcester sauce) ঢালিয়া তাহা উপভোগ করিতেন।

একবার শ্রীপক্ষ্মী বন্ধে আমাদেরিগের যশোহর ভবনে ৮দীনবন্ধু বাবু লীলাবতীর নদেরটাাদের অংশটা (part) অভিনয় করিয়াছিলেন। নাটক অভিনয় আমরা পূর্বে কখন দেখি নাই ও তাহার কোন ধারণাও ছিল না। কথকতা, ব্যাঙ্গ, পাঁচালী, কবির লড়াই, আখড়াই, হাফ আখড়াই, মনোহরসই এবং টপের গান শৈশব হইতেই পরিজ্ঞাত ছিলাম। এ আমাদের নিকট নতুন দৃশ্য। গ্রন্থকর্তা নদেরটাাদ সাজিয়া হাব-ভাব সহকারে অভিনয় করিবেন শুনিয়া আমরা সর্বাগ্রে রজস্থল অধিকার করিয়া বসিলাম। ক্রমে বৈঠকখানা লোকে লোকারণ্য হইয়া গেল। পিসিমাতারা পর্য্যন্ত গবাক্ষে দাঁড়াইয়া তামাসা দেখিতে লাগিলেন। “লীলাবতীকে” সম্বোধন করিয়া যখন নদেরটাাদ “অগ্নি হরিণ নয়নে তুমি কি পড়ো” বলিতে বাইয়া যেই “আই মা হরিণের সিং তুমি কি পড়” বলিয়া ফেলিল এবং অপসারিত চৌকীতে বসিতে বাইয়া ভূপতিত হইয়া চীৎকার করে কাঁদিয়া “হলামরে মেরে ফেলেরে” \* \* \* বলিল, তখন দর্শকমণ্ডলীর অটহাস্তে “যশোর-

নগরী” প্রকম্পিত হইতে লাগিল, তাহার প্রতিধ্বনিতে ভৈরবনদও বোধ হয় উজ্জ্বল বহিয়াছিল। অভিনয় সমাপ্ত হইবামাত্র শিমিমাতারা পিতৃদেবকে অস্ত্রপূরে ডাকিয়া পাঠাইলেন ও তিনি বাইবামাত্র তাঁহারা দুঃখিত ভাবে বলিলেন, “দুর্গা, দীনবন্ধুকে ভাইএর মতন স্নেহপাত্র মনে করি, সে ত খুব ভালই জানিতাম, আজিকার এ কি কাণ্ড? মাংস ভাজার (চপ্) সঙ্গে মদ ঢালিয়া ঢালিয়া খাইয়া এখন ত মাতাল হইয়া রক্তভঙ্গ করিয়া মাটিতে পড়িয়া চোঁচামেচি করিতেছে ও লোকজন হাসাইতেছে, ইহাতে আমরা বড় ক্ষুব্ধ হইয়া তোমাকে সব বলিবার জন্য ডাকিয়াছি।” পিতৃদেব তাঁহাদিগের কথায় উচ্চহাস্ত করিয়া কহিলেন “দীনবন্ধু মাংস ভাজার সঙ্গে মদ ঢালিয়া খান নাই, ও একরূপ চাটনী (Sauce) মদ না, ইহাকে অভিনয় বলে মাতলামী নহে। বিলাতে কত বড় বড় লোক এই অভিনয় করিয়া রাজদরবারে গণ্যমান্ত হইয়া থাকে, কত অর্থ উপার্জন করে, বড় মাহুষ হইয়া যায়। দীনবন্ধু রহস্যপ্রিয়, গুণীব্যক্তি, আমাদিগের জন্য তাঁর নিজের বই “লীলাবতী” অভিনয় করিতেছেন।” এই শুনিয়া তাঁহারা ত খুসি হইলেন ও স্বচতুর মিত্র মহাশয়ও পিতৃঠাকুর প্রমুখাৎ সকল অবগত হইয়া আমাদের গৃহে আবার নৈশ ভোজনের কথা তাঁহাদিগকেই বলিয়া খুব আপ্যায়িত করিলেন। সে রাজির আশারীয় একটু নতন রকমে প্রস্তুত করা হইল—(নবাবের নতন আতপ তক্তুলের ক্যান্সা ভাত ও যত প্রকার সিদ্ধ পোড়া তরকারী, গব্য ঘৃত মিশ্রিত), তাহা খাইয়া একবাক্যে সকলে বলিয়াছিলেন “পোলাও কোথায় লাগে, এ অবৃত।”

দীনবন্ধু বাবু লুসাই যুদ্ধ হইতে অস্থস্থ অবস্থায় প্রত্যাবর্তনের পরে আর আমাদিগের সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই, সর্বদা সংবাদ জানিতাম তিনি শয্যাগত। এমনি আশ্চর্য ঘটনা, তিনি যে দিন পরলোকগত হন সেই দিবস আমরা হঠাৎ কলিকাতায় “ভারত আশ্রমে” বাইয়া উপস্থিত হইয়া তাঁহার মৃত্যু সমাচারে অত্যন্ত মর্ষাহত ও ব্যথিত হইয়াছিলাম। পূর্বের সে সব অকৃত্রিম বন্ধুবান্ধব এক্ষণে স্বর্গলোকে, তাঁহাদিগের পিতৃবৎ স্নেহ মমতা নিত্য স্মরণীয় ও শ্রদ্ধার সামগ্রী।

সেকালের পিতৃহৃদয়গণ মাকে মাতৃসম্বোধন করিতেন, কখন বা আশুর মা বলিতেন, বয়স্ক পত্নী বলিয়া কোনরূপ পরিহাস করিতেন না। মুখের সম্মুখে প্রশংসা করা “Compliment দেওয়া”, তাঁহারাও স্বকচিসিক্ত ভাবিতেন না এবং মা-রাও স্বামী ভিন্ন অন্য পুরুষের স্তুতিবাদ অতি অসুচিৎ এবং অশোভন মনে করিয়া লঙ্ঘিত হইতেন। আজকাল মহিলাদিগের মুখের উপর হুখ্যাতি করা (Compliment) একটা নব্য সভ্যতা মধ্যে গণ্য হইয়াছে। কুমারী কন্যা হইতে আরম্ভ করিয়া তাহার মাতা, বর্ষীয়সী মাতামহীরা পর্যন্ত ইহার হস্ত হইতে মুক্ত নহেন। এসব নবীন পদ্ধতি স্বকলপ্রসূত নহে, ক্রমে উঠিয়া বাইলে মজল।

হরিপুর হইতে আমার শ্বশুরালয় গুণাইগাছা চারি পাঁচ ক্রোশ ব্যবধান। স্বচ্ছসলিলা বড়াল নদীর উপরিস্থিত ও প্রকৃতির মুক্ত শোভায় দেখিতে অতি মনোহর। দুর্ভিক্ষ তাহার চতুর্পার্শ্বে কখন প্রবেশ করিতে পারে নাই এমনি “শস্ত্র-শ্রামলা”। ধাত্ত ছোলা মটর অপরিমিতভাবে জন্মায় ও হরিদ্রা, সরিষা ফুলে বধন ক্ষেত্রভূমি পরিপূর্ণ হইয়া উঠে তখন নয়ন ফিরাইবার সাধ্য থাকে না, কেবলই মুগ্ধনেত্রে ইহা দেখিবার সাধ বায়। প্রকৃতি যেন সেখানে বার মাসে তের পার্বণের উৎসব করিতে থাকে। দেশে প্রবাদ এই যে বাগটী মহাশয়দিগের আগমনে ও কুলমর্যাদায় বড়ালের আড়াই বাঁক গন্ধা হইয়া গিয়াছিল। ব্রাহ্মণ প্রধান গ্রাম তথাপি শ্বশুর মহাশয়রা সেখানে বংশ গৌরবে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ। আমার স্বশ্রদ্ধেবীও “বৌখড়ের” চৌধুরী কন্তা, ধনপদ মান বংশ সর্ব্বাংশে তিনিও অতীব মাননীয়। বিবাহান্তে প্রথম বধন আমি স্বশুরালয় বাই আমার সঙ্গে দাসদাসীর এক রেজিমেন্ট গিয়াছিল, তাহাতে স্বশ্রুমাতা কষ্ট ও অপ্রসন্ন হইয়া বলিয়াছিলেন,

“বৌএর নাই রবের ঠাই

বৌএর সাথে যোল’শ দাই।”

“কাটা কাপড়” পরা (সমিঙ্গ, জ্যাকেট) লেখা পড়া জানা (জানা কিছুই নহে) নব বধুর আগমন বার্তা গ্রামময় প্রচার হইবামাত্র আবালবৃদ্ধবনিতা সমস্ত অসময়ে আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিলেন। আমি একটা দর্শনীয় পদার্থ হইয়া উঠিলাম। অনেকে আবার কোতুহল বশতঃ আমার পড়া শুনিতে চাহিলে ভদ্রতার অহরোধ উপেক্ষা করিতে পারিতাম না ও হুর্ভাগ্যবশতঃ খেলনার সঙ্গে একটা কন্সার্টিনা বাজু ছিল তাহাও বাজাইয়া শুনাইতাম। এসব যে কোনরূপ দোষাবহ ও লজ্জাহীনতা তখন বুদ্ধিতে পারিতাম না এবং প্রবাসে প্রবাসে থাকার জন্য উচিত প্রকার অবগুণ্ঠনে মুখাবৃত করিতে অসমর্থী, কাজে কাজেই “মেম বো” পল্লী মধ্যে প্রচারিত হইয়া আমার ক্রটির নিমিত্ত পিতা মাতার শিক্ষার প্রতি অল্পকম্পা প্রকাশ হইতে লাগিল। মনে বাহাই হউক প্রকাজে স্বাশুড়ী মাতা সমালোচকদিগের বাক্যের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া সকলকে থামাইয়া দিলেন ও আমাকে গোপনে ঐ সব করিতে বাধা করিলেন। তাহার পর লোকজন সমাগত দেখিলেই গৃহের ভিতর লুকাইয়া রহিতাম, ঠাকুরাণী হাত ধরিয়া বাহিরে না আনিলে কখন কাহারো সম্মুখে আসিতাম না, কথা ত একে-বারেই বন্ধ। পল্লীগ্রামের পূর্ব্ব নিয়মামুসারে ভাতুর ও মামা শ্বশুরই সর্ব্বপেক্ষা গুরুতর মাত্ত ব্যক্তি, শ্বশুর পিতৃভূলা, এই দুইজনকেই অত্যন্ত মানিয়া চলিতে হয়, তাঁহাদের ছায়া দর্শনও পাপজনক।

বংশাঙ্কনে শ্বশুরমহাশয়দিগের লাঞ্ছনাজ ব্রহ্মোত্তরে বাস। “ঠাকুরাণী” অল্প-বয়সে কয়েকটা পুত্র কন্তা লইয়া বিধবা, সেই হইতে তিনিই গৃহের একমাত্র কর্তা ছিলেন ও আজীবন ব্রতচার ও ব্রহ্মচর্যের কঠোর নিয়ম পালনে কুশাসিনী এবং

দিবসের অধিকাংশ সময়ই পূজা আহিকে অতিবাহিত হইত। ক্ষেত্রজাত ধান্ধই তাঁহার ধনরত্ন স্বরূপ ছিল ও অগ্রহায়ণ শোষে যখন সুগন্ধ ধান্ধে তাঁহার প্রাঙ্গণ পূর্ণ হইয়া বাইত তিনি রাজি জাগিয়া বহুসে সেই সব ধান্ধ সিদ্ধ করিয়া দেব-দুর্লভ তুল প্রস্তুত করিতেন। তাহাতে সঞ্চয়র স্বচ্ছন্দে সংসার বাজা নির্বাহ ও অকাভরে অতিথি সেবা চলিত। কত অনাথ দরিদ্র ছাত্রকে গৃহে আশ্রয় দিয়া পুত্রবৎ প্রতিপালন ও পাঠের ব্যয় ভার বহন করিতে সতত অগ্রসর থাকিতেন। দু'চারিটী “ভিক্ষা পুত্র” (উপনয়নের সময় অগ্রে ব্রত ভিক্ষা দিয়া পুত্র লাভ) গৃহে থাকিতই। তাহাদের কার্য, পাঠাভ্যাসের পরে তাঁহার আরাধ্য দেবতার পূজা করা। লক্ষ তুলসীপত্র শালগ্রামের মস্তকে দিবার মন্ত্র তিনি বলিয়া দিতেন, বালকগণ তাহা মুখস্থ করিয়া তাঁহার সম্মুখে বসিয়া পূজা করিত। শুনিয়াছিলাম কোন একজন ছাত্র প্রকৃত মন্ত্র না জানায় শালগ্রামের ভোগের সময় বলিয়াছিল, “My dear Shalgram, accept this vegetable kingdom and oblige.” সেইজন্য তিনি দেবারাধনাকালীন উপস্থিত থাকিতেন। খাটি সোণা যেমন পোড়াইলে আরো উজ্জ্বল হয়, তেমনি জীবনের দুদিনে স্বশ্রমাতার ধর্ম পরীক্ষায় আসাধারণ মানসিক শক্তি দেখা গিয়াছিল যে, তাঁহার সর্বকনিষ্ঠ পুত্র উপবীত ত্যাগ করিয়া সমাজচ্যুত হইলে তিনি অবিচলিত দৃঢ়ভাবে স্বীয় বিশ্বাসানুসারে পুত্রকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহার স্পৃষ্ট জলও কখন স্পর্শ করিতেন না। ধার্মিকপুত্রও মাতার যোগ্যতর সন্তানের ন্যায় এ সকল ক্রেশ অনায়াসে সহ্য করিয়া গিয়াছেন।

কোন সময় “ঠাকুরাণী মাতার” লাধরাজ ব্রহ্মোত্তরে জনৈক অর্ধচাঁচী মুসলমান জমীদার কর স্বাপনের জন্য অত্যন্ত উৎপাত আরম্ভ করিয়াছিল, তাহাতে প্রথমে তিনি কর্ণপাতও করেন নাই। জমীদারের গোমস্তা আসিলেই আদালতের শরণাপন্ন হইতে বলিয়া তাড়াইয়া দিতেন। ক্রমে ভয়মনোরথ হইয়া পঞ্চদশ কাটার সময় এক দিবস বহু লোক পাইক সর্দার সমভিব্যাহারে স্বয়ং “নায়েব মহাশয়” বিশ্ব ঘটাইতে আসিয়াছিল। বেলা দ্বিতীয় প্রহর, ক্ষেত্র হইতে কৃষকগণ কেবল আহার করিতে গৃহে আসিয়াছে, তখনি দস্যুরা পঞ্চদশ সকল লুণ্ঠনে প্রবৃত্ত হয়, স্বশ্রমাতা ইহা শ্রবণমাত্র সামান্য সংখ্যক কৃষক সঙ্গে সেখানে উপস্থিত হইয়া লাঠির সাহায্যে সেই জনসম্মুখ সীমান্ত পারে বিতাড়িত করিয়া চিরতরে নিরাপদ হইয়াছিলেন। সেই ধনগর্বিত জমীদার আর কখনও সে পথে পদার্পণ করে নাই। “ঠাকুরাণীর” সেই অসীম সাহসের খ্যাতি এক্ষণেও সর্বত্র পরিব্যাপ্ত।

সেই বিবাদের পর হইতে গৃহ প্রাচীরে দুইটী পুতলিকা গড়াইয়া প্রত্যহ পূজাস্তে শত্রুর গালে চূণকালি ও মিষ্টের মুখে পুষ্প চন্দন দিতেন। একটা যুক্তিকা নির্মিত ও অন্তর্গত গোময়ে গঠিত ছিল। প্রভাতকালে গাজোখান করিয়া

গৃহ দেবতা দর্শনান্তর গরিব প্রতিবাসীর কাহার কি অভাব ঘরে ঘরে জানিয়া তাহাদিগের আহারীয় সাধ্যমতন দিয়া আসিতেন এবং তাহারাও অল্পগত তৃত্যসম তাঁহার আজ্ঞা শিরোধার্য করিয়া কৃতার্থ হইত। সেই কারণে ক্ষুদ্র প্রজামণ্ডলীর সভাভব ও শোক দুঃখের প্রতি তাঁহার তীক্ষ্ণদৃষ্টি ও মহাহুত্বুতি থাকায় এক অর্দ্ধবয়সী ব্যক্তির ইহলোকের সুবিধা এবং পরলোকের জলপিণ্ড প্রাপ্তির জ্ঞাত্ব দ্বিতীয় পক্ষে বিবাহ দিয়াছিলেন। গৃহাভ্যন্তরে তরুণী বৃদ্ধে কিরূপ বাক্যালাপ হইত তাহা অবগত নহি, তবে বাহিরের সম্ভাষণটা অতি কোতূকাবহ ছিল। সরকারজী প্রাতে দুগ্ধ চিড়া ভক্ষণ করিয়া ক্ষেত্রে বাইত এবং গৃহে প্রত্যাগমন পূর্বক নব বধুকে উঠেখরে “ও বাড়ী, বাড়ী আছ” বলিয়া ডাকিয়া পাড়া তোলপাড় করিত। তাঁহার এই অপূর্ব সম্ভাষণ শুনিবার নিমিত্ত ছোট ছোট বালক বালিকারা পথে দাঁড়াইয়া “ও বাড়ী বাড়ী আছর” প্রতিধ্বনি করিতে থাকিত। আমরাও যে কয়জন বালিকা বধু গৃহে ছিলাম হাসিয়া গড়াইয়া পড়িতাম, ঠাকুরাণীও হাসিয়া বলিতেন চৈতন্তের কোন বুদ্ধি নাই, বোটা কে লোকসমাজে কেমন লজ্জা দেয়। “ও বাড়ী, বাড়ী আছ” অস্ত্রের মূখে পরিহাস-স্ফূলে শুনিবার ভয়ে সরকার জায়া কোন প্রতিবাসীর বাড়ী কখন বেড়াইতে বাইত না, কেবল তাঁহার নিকট নির্ভয়ে আসিয়া বলিয়া থাকিত।

জীবনে তিনবার মাত্র স্বপ্তারালয়ে গিয়াছিলাম। দ্বিতীয় বারে কোন অনিবার্য কারণে ঋক্টাকুরাণীর সঙ্গে আমাকেও বিক্রমপুর বাইতে হইয়াছিল। একজন পুরাতন দাসী আমার সহিত ছিল, সেই আমার পিত্রালয়ের বন্ধু, আর সবই মানিয়া চলিবার সম্পর্ক। এ প্রবাস বাজা আমার পক্ষে বড় কষ্টদায়ক হইয়া উঠিয়াছিল। “স্বর্ণগ্রাম বিক্রমপুর” ঐতিহাসিক স্থান, রাজা রাজবল্লভের প্রাচীন রাজধানীর ভগ্নাবশেষ ও অজ্ঞাত দৃশ্য সব এক্ষণে বিশ্বস্ত স্বপ্নের স্থায় হইয়া গিয়াছে। ইচ্ছা সুখে যাহা দেখা যায় তাহাই স্মরণ থাকে, উপর উপর দেখিয়া শুনিয়া শৈশব স্মৃতি বহু দিন আগ্রত রাখা বড় কঠিন।

আমরা যে গ্রামে গিয়া উঠিয়াছিলাম তাহার নাম “কোমরপুর”। বৈজ্ঞ শ্রেষ্ঠ স্থান, রাবণরাজা কবিরাজ পুত্র রামরাজা কবিরাজ মহাশয় যত দুরারোগ্য ব্যাধির চিকিৎসা করিতেন ক্ষয়কাশ ও উন্মাদ রোগই তাহার মধ্যে প্রধান। কত দেশ দেশান্তর হইতে রোগী আসিয়া তাঁহার গৃহে, গ্রামে কি দূরে নৌকায় থাকিয়া তাঁহার দ্বারা চিকিৎসা করাইতেন। দাতব্য ঔষধ, রোগী আরোগ্য হইলে উপযুক্ত পারিতোষিক দিতে হইত। গরিব দুঃখীর নিকট তিনি অর্থ গ্রহণ করিতেন না। অমনি দেখিতেন। তাঁহার গৃহ প্রাঙ্গণে রাজি ঘিন “পাক তৈল” “মধ্যম্নক্কায়ণ তৈল” নানাবিধ দ্রব্য ও “রসায়ণ” পাক ও প্রস্তুত হইত। প্রভাত হইতে সায়াক পর্য্যন্ত রোগীতে বাড়ী পূর্ণ থাকিত; তিনি অক্লান্তভাবে তাহাদিগকে দেখিয়া দেখিয়া ব্যবস্থা এবং ঔষধ বিতরণ করিতেন। সাধারণ

অনেক উন্মাদগ্রস্ত রোগী তাঁহার গৃহে থাকিবার স্থান পাইত ও তিনি স্বয়ং ঔষধ পথ্য সেবন করাইয়া দিতেন, তাহাতে কেহ কেহ একেবারে আরোগ্য লাভ করিত। আমরাও গ্রামের এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের গৃহে আশ্রয় লইয়াছিলাম। তাঁহার ব্রাহ্মণ পণ্ডিত-অতি সরল প্রকৃতি ও সাংস্কৃতিক ভাবাপন্ন ছিলেন। গণ্ডগ্রাম, ত্রিহাদ কিছু ছিল না। দৃষ্ট কোনদিকেই মনোজ্ঞ নহে, বেতবনে চতুর্দিক আবৃত এবং আসন্ন মৃত্যু রোগীর বাসে যেন সব নিরানন্দ আকার ধারণ করিয়াছিল। গ্রামে নদী নাই, ছোট ছোট পুকুরিগীর জলে ও কুপোদকে দৈনিক কার্য্য নির্বাহ এবং অস্তিম ক্রিয়াও সমাধা করিতে হইত। প্রত্যেক গৃহস্থের বাড়ীর পশ্চাতে নিজ নিজ স্নান। শবদাহের দৃষ্ট দেখিয়া আগন্তকের হৃদয়ে যুগপৎ ভয় এবং বিসাদ সঞ্চার হয়। এই অভাবনীয় দৃষ্টে আমার শরীর মন ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। সেই যে কষ্টকর হাঁপানী রোগাক্রান্ত হইয়াছি এ পর্য্যন্ত তাহার হস্ত হইতে মুক্ত হইতে পারি নাই।

যদিও বিবাহ সম্পর্কে ঢাকা, ময়মনসিং, বিক্রমপুর প্রভৃতি কুটুম্ব স্থান তথাপি কতক কতক আচার ব্যবহার আমাদের দেশের সহিত সম্পূর্ণ পৃথক। ভোজ ফলাহার সব অন্য প্রকার। একটা ভোজের আয়োজনে সমগ্র দেশের লক্ষা, “মরীচ” আনীত হইয়া এক একটা ব্যঞ্জন লোহিত বর্ণে রন্ধনশালা আলো করিতে থাকে। শোণনদ্বয়ের আবির্ভাবে সকল লালে লাল হইয়া যায়। জনশ্রুতি তাহাতে বিদাহী শক্তি না থাকায় ভোজনে অতীব উপাদেয়। পূর্ব বঙ্গের পল্লী-গ্রামে আহারীয় অব্যাদি সেকালে বড় হুমুলা ছিল, রীতিমত বাজার বসিত না, সপ্তাহে একবার মাত্র হাট লাগিত, সেইদিন সমস্ত ক্রয় করিয়া রাখিতে হইত, বৃহৎ মৎস্য ত পাওয়াই স্বকঠিন। এ অনেক কালের কথা, এক্ষণে দেশকাল ভেদে রীতি নীতি পরিবর্তনের স্রোতে ভাসিয়া যাইয়া আবার নবীনভাবে সব দেখা দিয়া থাকিবে।

“একাদশীতে” নির্জলা উপবাস করা ও অঞ্চলে নাই। বাল্য-বিধবা কিম্বা অক্ষম বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীরা “ঐ দই” খাইয়া একাদশী পালন করেন। আমাদের রাজসাহী জেলায় মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বেও তৃষ্ণাকাতর বিধবা নারীগণ একাদশী দিনে গঙ্গা জলও পান করেন না। এমন কঠোর নিয়ম রক্ষা করিতে কুজাপি দেখি নাই। কালের পরিবর্তনে তাঁহাদের বৈধব্য প্রথার কোনরূপ শিথিলতা দেখিতে পাওয়া যায় না। সেই পূর্ববৎ জিবেগী তটে উদয়াস্ত দুঃস্বপ্ন নীতে মাঘে কল্প বাস, চতুর্থাস্তায় এক সিন্ত বস্ত্রে থাকিয়া কাঁচা দুগ্ধমাত্র পান এবং অধিকাংশ তিথিতে অনশনে থাকিয়া জীবন বাপন করিয়া জন্মান্তরে আর বৈধব্য সংঘটন না হয় তাহাই কায়মনোবাক্যে কামনা করেন।

দুর্ভাগ্য যে একা আইসে না এতদ্য অতি সত্য। বিক্রমপুর হইতে নিম্নলিখিত ক্রিয়া পিজালয় আসিবার দিন কতক মধ্যে আমার বিবাহের দানের ও

যেতুকের বহুমূল্য সম্ভার বজালদ্বার চোরে লইয়া যায়। বহু পুরাতন ভূতাপুত্র ও অপরিজ্ঞাত এক ব্রাহ্মণ তনয় আমাদের অন্ত্রে প্রতিপালিত হইয়া কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ আমার সর্ব্বত্র অপহরণ করিয়া পলায়ন করে। আমাদের হরি-পুরের বাড়ী চোর ডাকাতির প্রবেশ পথ নাই, নদীর ঘাট হইতে গ্রামে বাইবার দুইপার্শ্বে “মেটে” জাতি শীকারিগণের বাস, তাহারা প্রহরীরূপে জমীদারের গৃহরক্ষা করে। তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়া গ্রামে ডাকাতি করা অসম্ভব। বংশপরম্পরায় দেশের সমস্ত জনপদের সঙ্গে পরিচিত থাকায় কাহার এমন সাহস যে “চৌধুরী বাড়ী” চুরি ডাকাতি করিবে? বহুকাল পূর্বে—যুগ যুগান্তরের কথা,—একবার নাকি ছোটবাড়ীর “দেড়ে কালীকান্ত” \* শত্রুতা করিয়া গভীর রাজ্যে লোকজনসহ ডাকাতি করিতে আমাদের গোলামাল আসিয়া পড়িয়াছিল। সেইখানে পিতৃদেবের পিসিমাতা শয়ন করিতেন। তিনি গোলমাল শুনিয়া জাগ্রত হইয়া দেখিলেন ডাকাত সাজে দেড়ে কালীকান্ত। তিনি রাগে চীৎকার স্বরে বলিয়া উঠিলেন “তোরা এত বড় আশ্পর্দা যে আমাদের বাড়ী ডাকাতি করিতে আসিয়াছিস? আমি বাঁচিয়া থাকিতে এ বাড়ীর কিছু লইতে পারিবি না, এখনি তোকে জব্দ করিব।” বলিতে বলিতে নির্ভয়ে বাহির হইয়া পাইক সর্দার ডাকিয়া সব ধরাইয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার এই অসম সাহসের ও অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য বদ্ধ গৃহে ডাকাতেয়া বন্দুক আওয়াজ করিয়া তাঁহাকে চিরকালের নিমিত্ত বধির করিয়া দিয়াছিল। সে অতীত যুগের ঈর্ষান্বিত শত্রুর প্রতিহিংসা বা ডাকাতির পরে প্রথম আমার অলঙ্কার চুরি যাওয়া। থানা পুলিশ স্বয়ং জমীদারের আমলারাই, কোথাও কিছু সংবাদ না দিয়া চোরদিগকে অতি প্রহারে চুরি স্বীকার করাইয়া অর্দ্ধমৃতবৎ অবস্থায় সদরে চালান দিলেন। কাছারীতে সেই সকল প্রকাশ হইয়া তাহারা নিষ্কৃতি লাভ করিল, অনেক অর্থ-ব্যয়ে আমলাবর্গ শ্রীঘর দর্শন করিলেন না মাত্র। দোষীর মুক্তি সমাচারে গ্রামের লোকে একত্র হইয়া চোরদিগের শাসনের জন্য ধর্মঘট করিলেন এবং তাহাদিগের অপরাধের দণ্ড বিধান এক ঘরে করা স্থির হইয়া গেল। তাহারাও পৈতৃক ভিটা ছাড়িয়া পলায়ন করিল।

\* কলির ভীমরূপী “ছোটবাড়ীর কালীকান্ত” চৌধুরী গোদীরই একজন, তাঁহার আবক্ষ লব্ধমান ধনাবৃত অশ্রু থাকায় তিনি ঐ নামে পরিচিত। বলিদানের উচ্চ ছাগশোণিত শোষণ করিয়া পান করিতেন, একটা প্রকাণ্ড রোহিত মংস্ত, বহুবিধ ব্যঞ্জন এবং রাশীকৃত অন্ত্রে তাঁহার জটরানল নির্বাপিত হইত না। চেহারা যেন জলদহা, অজন্মের বৎসরে মহাজনের ধাতু লুই ও তাহা অনাথ দরিদ্র মধ্যে বিতরণ করিতেন। অল্প দিকে আবার কাহারো সহিত কলহ হইলে তাহার আর ইহলোকে নিস্তার ছিল না। মিত্রের জন্য হস্তান্ত্রে সর্ব্বত্র দিয়া দিতেন, গ্রামের গরীব দুঃখী কষ্টাক্ষত্রপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের সাহায্যে ও মৃতের সংকারে সতত অগ্রসর ছিলেন। দোষে জ্ঞানে এমন একব্যক্তি আজ কালের দিনে দেখিতে পাওয়া যায় না। তাঁহার ভয়ে পাড়া যেমন কম্পমান থাকিত, তেমনি আবার দুঃখীর ক্রন্দন শ্রবণে একেবারে ভবীভূত হইয়া বাইতেন। কি দিয়া যে তাহার অভাব মোচন করিবেন ভাবিয়া পাইতেন না। দুটের দমন আর শিষ্টের পালনই তাঁহার রাজধর্ম ছিল।



পূর্বের কথায় কথায় আদালতের আশ্রয় ভিক্ষা করা অপমানজনক ছিল, জমীদারগণ নিজ নিজ কাছারীতে রীতিমত বিচারাসনে বসিয়া অপরাধের সমুচিত শাস্তি দিতেন। সর্বাপেক্ষা গুরুতর হও “একঘরে” করা। কন্ডার বিবাহ, পুত্রের উপনয়ন, পিতৃমাতৃ শ্রাদ্ধ বন্ধ, গ্রামে কাহারো নিমন্ত্রণ নাই, শুক পুরোহিত ধোপা নাগিত হাস হাসী, এবং ভূঁইয়ালী পর্যন্ত এককালীন রহিত। পথে ঘাটে বাহির হওয়া দুঃসাধ্য। বাজার হাট বাইতে হইলে সাধারণ লোকের বালকেরা পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছড়া গাহিতে গাহিতে হাততালি দিয়া ব্যঙ্গ করিতে থাকে। সে সব গ্রাম্য ছড়াও শুদ্ধ, যেমন “চোরের বাপের ডাগর গলা, আরো চায় পাকা কলা।” “এত রক্ত দেখালি ভবানন্দের মা, পিঠে যে ভাজলি তার হাত পা।” “আগুনো পোহাই কাপড়ো সৈকি, যে যা করে তাও দেখি।”

সর্বাপেক্ষা দুর্গতি “একঘরে” ব্যক্তির গৃহে মৃত্যু সংঘটন হইলে সংকার করিবার লোক ও দাহের কাঠ পাওয়া যায় না! কাহারো কোন সহানুভূতি নাই, বাসিমরা হইবার ভয়ে প্রিয়তম আত্মীয় স্বজনের মৃতদেহ আপন স্বর্গে বহন করিয়া শ্মশান ঘাটে লইয়া অশ্রুচিক্রিয়া নির্বাহ করিতে হয়, জনপ্রাণী সাহায্য করে না। এ শাস্তি কাসির অপেক্ষাও ভয়ঙ্কর। বৃটিশ সিংহের ঘোরতর ভীষণ গর্জন, কোর্ভা কুণ্ডী পরিহিত, খেতরুঞ্চ গুন্ডমারী পাহারাওয়ালার বন্দও গ্রহার ও প্রাচীর বেষ্টিত অন্ধকূপে আবদ্ধ প্রভৃতি শাসনেও বাহ্য প্রতীকার না হয় এ সামাজিক শাসন হও তদপেক্ষা স্থায়ী ফলদায়ক। মনুষ্যজাতি সমাজচ্যুত হইয়া কখন বাঁচিয়া থাকিতে পারে না, ইহা স্থির নিশ্চয়।

নানারূপ পারিবারিক বিপদ আপদের জন্ত অনেক দিন আমার খন্ডরালসে বাওয়া ঘটে নাই, তখন আমরা বশোহরে থাকিতাম। আদান প্রদান তদ্ব্যবধান পূর্ববৎ চলিয়া আসিত, শীতে গুড় নারিকেল নূতন চাউল গীঠের সরঞ্জাম, বৈশাখে ফল মিঠার ও শারদীয় পূজার সময় নব বস্ত্র ও সেই সঙ্গে পার্কীগী সমানভাবে দিয়া তাঁহাদিগের মর্যাদা রক্ষা ও মনস্তৃষ্টি করিতে হইত। আমার পিতৃবলারাই দেশে থাকিয়া সে সকল নিয়ম রক্ষা করিতেন।

প্রিয়র জন্ম পরে আর একবার আমি কন্ডাসহ খন্ডরালস গিয়াছিলাম, সেই শেষ। স্বপ্নমাতা তাহাকে দেখিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য হইয়া নাম রাখিয়াছিলেন “গিরিবালা”। জানিনা কেন তাঁহার দত্ত “গিরিবালা” লুপ্ত হইয়া প্রিয়রদ্বা বজায় রহিয়া গেল। যদিও সে গ্রামের লোক তাহাকে ঐ নামেই ডাকিতেন এবং কত স্নেহ আদরে বিবিধ খেলনা ফল সর্বদা আনিয়া দিয়া বাইতেন ও ক্ষুদ্র “গিরি” তাঁহাদিগের ভালবাসায় মুগ্ধ হইয়া সেখান হইতে পুনর্ব্বার মাতামহালয়ে ফিরিয়া আসিতে চাহিত না, তবুও আমরা আবার বথাকালে পিত্রালয়ে প্রত্যাগমন করিলাম। এ বাজার আমি পূর্ণ মাত্রায় লজ্জাশীলা কুলবধু ও ছোটখাট গৃহিণী। কেহ কোন ক্রটি ধরিতে পারিত না, “ঠাকুরাণী” তখন সর্বসম্মুখেই আমার প্রতি

অত্যধিক স্নেহ দেখাইয়া অল্প বয়সের অপ্রীতিভাঞ্জন হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাহার পর তাঁহার ও আমার জীবনের উপর দিয়া কত বজ্রাবাত্য বহিয়া গেল, তিনি ভয় ক্ষয়ে রোগ শোকে ভুগিয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া দিব্য ধামে চলিয়া গেলেন, আমিই পশ্চাতে পড়িয়া রহিলাম। তাঁহার “গিরিবালাকে” মৃত্যুকালে তিনি অশেষ প্রকার শুভাশীর্বাদ করিয়া বান। আমাদের ভাগ্যক্রমে তাহার একটাও ফলপ্রসূ হয় নাই। প্রিয়জন মৃত্যু শোকে জীবনের সমস্তই বার্থ হইয়া গিয়াছে। শুনিয়াছিলাম খন্ডর কুলে ব্রহ্মশাপ থাকায় কল্যাণ সকলেই প্রায় নিঃসন্তান বিধবা এবং পুত্রহিণেরও বংশের উন্নতি নাই, জন্ম মৃত্যু লইয়া কোনরূপে তাঁহারা জীবিত আছেন এইমাত্র। তাঁহাদিগের মাতুল বংশ এককালীন লোপ পাইয়াছে। কালের বিচিত্র গতিই এ প্রকার।

আমি যোগেশের অন্নপ্রাশন যেমন একত্র হইয়াছিল তেমনি তাহাদিগের উপনয়নও একসঙ্গে সম্পন্ন হয়। ছোট ভাই দুইটা এক পালকী চড়িয়া পুরাতন চাকর সহ হরিপুর বাইয়া পৌছিলে সেখানে উৎসবের শ্রোত বহিয়া গেল, আমিও তখন সেখানে ছিলাম। জ্যাঠামহাশয় স্বয়ং আশুর গলায় যজ্ঞোপবীত ও কানে গায়ত্রী মন্ত্র দিলেন। আর অন্য একজন জ্ঞাতি যোগেশের দীক্ষা গুরু হইলেন। জ্যেষ্ঠতাত আমাকে ব্রত ভিক্ষা স্বরূপ কয়েকখানি লাভজনক গ্রাম দিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিলেন কিন্তু পিতৃঠাকুর তাহা লইতে দেন নাই। তাঁহার দৃঢ়তর বিশ্বাস ছিল ভাবীকালে পুত্র কুটুম্বী হইয়া বংশগৌরব রক্ষা করিবে। উপনয়নের ভিক্ষায় পঞ্চখানি গ্রাম লইয়া পরে জ্যেষ্ঠতাত পুত্রের সহিত মনো-মালিন্য খটিতে পারে সেটা ইচ্ছনীয় নহে। ভূমি দানের নিয়ম, গঙ্গাস্নাতিক মন্ত্রপুত করিয়া নবীন ব্রহ্মচারীর হস্তে দেওয়া, তাহাতে রীতিমতন লেখাপড়া ন থাকিলেও কিছু আইসে যায় না এবং ভবিষ্যতে বংশাহুক্রমে স্বস্তি রহিয়া যায়। মাঘ মাসের শীতে ব্রহ্মচারীবেনী ক্ষুদ্র দুটা বালক প্রাতঃস্নানান্তে যখন বেদপাঠ শিক্ষা করিত, তখন তাহাদিগের সেই শান্তিপূর্ণ দিব্য মুখকান্তি ও সৌম্যমূর্তি দেখিয়া ভ্রাতৃপুত্রগতপ্রাণা পিসিমাতারা আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতেন। উপবীত ধারণের পূর্বের যদি অসময়ে মেঘ-গর্জ্জন হয় তাহাতে উপনয়ন অসিদ্ধ হইয়া থাকে। ভ্রাতাগণের যজ্ঞোপবীতের দিনে হঠাৎ ঘন মেঘগর্জ্জন ও বৃষ্টিপাতে সব আবার তিনদিন পর নুতন করিয়া করিতে হইয়াছিল। বর্ষার জল বাড় ও মেঘের ডাকে কোন ক্ষতি নাই, অকালে তাহা হইলেই গোল। এই কারণে আশুর উপনয়নও অন্নপ্রাশনের তায় দুইবার হয়।

উপনয়নের এক বৎসর আশুরা পূর্ণ মাজার ব্রহ্মচারী থাকিয়া কাহারো অন্ন-জল ও অখাত স্পর্শ করিত না। রীতিমত একাদশী পালন ও মৌনভাবে বসিয়া আহার করিত। বাড়ী হইতে যশোহর প্রত্যাবর্তন কালে রন্ধনের ভার আমা- উপর পড়িয়াছিল। রাজি প্রভাত হইবার আগেই আমাদের পাকী রন্ধে বাহকগণ

গ্রাম্য তান লয়ে গীত গাহিতে গাহিতে চলিতে আরম্ভ করিলে আমরাও উবার মোহিনীমূর্তি দর্শনে ও বিহকের সঙ্গীতে আগিয়া উঠিতাম। কত গ্রাম কত প্রশান্ত মাঠ বাট অতিক্রম করিয়া দ্বিপ্রহর বেলায় কোন এক নদীতীরে ছায়ায় অস্বস্তি বৃক্কতলে পাড়ী নামাইয়া স্নানার্থের আয়োজন হইত। ব্যবস্থা সব তৃত্য ঈশ্বর দাস করিয়া দিত, আমি উপলক্ষ মাত্র। ভ্রাতারা স্নাত দেহে গরম পরিয়া আহায়ে বসিয়া বাইত ও শিবের নন্দীকৃপী ঈশ্বর দাস দূরে পাড়াইয়া অস্ত্র জাতির গমনাগমন বন্ধ জন্ত পাহারা দিত। তাহার জিন্দামার কাহারো ছায়াপাত হইবার হুকুম ছিল না, এমনি কড়া প্রহরী। তিন দিবস পথের মৃত ব্যতীতে রহিয়া স্থব ও সবল শরীরে ভ্রাতাগণসহকারে যৎকালে আমরা যশোহর পৌছিলাম, আমাদিগকে দেখিয়া পিতা মাতার এবং অস্ত্র পরিজনবর্গের মনে যে কিরূপ আনন্দ হইয়াছিল তাহা বাক্যে প্রকাশ করা অসাধ্য। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের রাজত্ব লাভেও এমন পূর্ণ সুখ তাঁহাদিগের নিকট স্পৃহনীয় ছিল না। তখনকার সে সব উৎসব আনন্দের কথাবার্তা এখন যেন স্বপ্নের ত্যায় হইয়া গিয়াছে। পরমারাধ্য জ্যেষ্ঠ-তাত, পিতৃষসাগণ এবং পিতৃদেব কেহই আর ইহলোকে নাই, কেবল তাঁহাদিগের পবিত্র স্মৃতি আমাদিগের নিত্য সম্বল। যদিও আজকাল বিদ্যালয়ে পরকীয় ভাষায় বিদেশীয় বংশাবলী মুখস্থ করা নিয়ম, তথাপি প্রত্যেক গৃহের মাতা কিবা পিতামহীরা অতীত কালের সমস্ত বিষয় ও পারিবারিক বংশাবলী বালক বালিকাদিগকে শিক্ষা দেন ও ঐ সকল প্রত্যহ আলোচনা করেন, তাহাতে ভাবী বংশধরগণের দেশাত্মবোধ এবং পারিবারিক জীবনের ভক্তি প্রীতির বন্ধন আরো বাড়িয়া যায়। আধুনিক অনেক যুবক যুবতীরা পিতা ভিন্ন অস্ত্র পূর্ব-পিতৃপুরুষের নাম বলিতে পারেন না। যিনি পিতামহের নামটা জানেন তিনি বড় “স্বদেশী”! নেলসানের উচ্চ অথবা চতুর্দশ গোষ্ঠীর ইতিহাস শিখিয়া শুধু বুদ্ধি বিপর্যয় বটে ও ভবিষ্যতে “ইতোব্রষ্ট ততোনষ্ট: ন পূর্বং ন পরং” হইয়া থাকে।

বর্ষার প্রারম্ভে যশোহর জেলার চতুর্দিকে দারুণ ম্যালেরিয়া জরের প্রাদুর্ভাবে শোচনীয় দশা উপস্থিত হইত। আমরাও যখন ছিলাম তাহার হস্ত হইতে মুক্তি পাই নাই। সে সময় জরের প্রথম দিন নিরন্তর উপবাস, দ্বিতীয় দিনে “পঞ্চকোল”\* পান, তৃতীয় দিবসে ষৈ মিছরী, চতুর্থ দিনে মুগ মশুরের মুগ, পঞ্চম দিনে “কাঠ খোলায়” অর্থাৎ বালুকা দ্বারা নহে, চিড়া ভাজা ও বাতাসা পথ্য। এই প্রকার শুকাইয়া শুকাইয়া অষ্টাহ পরে “চালে ডালে”\*\* কিবা অতি পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন পথ্য পাওয়া বাইত। শীতল জল পান নিষিদ্ধ ছিল। এখনকার মত বরফ,

\* পঞ্চকোল পান বিশেষ, “বচ পিপুল চই আদার হুঁট ও ক্ষেত্র পাণড়ি” এক সের জলে সিদ্ধ করিয়া আধ পোয়া থাকিতে সন্ধ্যা লবণ সহ উষ্ণ উষ্ণ সেবন করা বিধি।

\*\* “ডালে ডালে,” এক তোলা অতি পুরাতন ডাল ও এক তোলা মুগের ডাল চৌদ্দ খুরী জলে তেজপত্র ও লবণ সংযোগে রন্ধন করিয়া পথ্য দেওয়া নিয়ম ছিল।

লেমনেড, শোভা প্রভৃতি রোগীরা চক্ষেও কখন দেখেন নাই। বৈজ্ঞানিক ঔষধের পুঁচু উত্তরীয়ে বাঁধিয়া পদব্রজে আসিতেন, রোগীর মাড়ী ধরিয়া বায়ু পিত্ত ককের প্রকোপ নির্গম্যস্তর ঔষধ পথ্যের ব্যবস্থা দিয়া চলিয়া বাইতেন, সপ্তাহের দর্শনী ( Fees ) দুইটি মাত্র রক্তত মুদ্রা।

সরকারী কার্যে পিতৃ ঠাকুরকে একখানে স্থির হইতে দেখে নাই। আবার বশোহর হইতে কৃষ্ণনগর বদলী আজ্ঞা আসিল, এবার শাপে বয় হইল। আমরা নতুন নগর দেখিব আশায় আনন্দিত, পিতা মাতা পুত্র দেবেজ হারা বশোহর ত্যাগে শাস্তি লাভ করিয়াছিলেন। “অন্নদা মঙ্গলের” কবিগুণাকরের ধরনীধনর কৃষ্ণচন্দ্রের রাজধানী প্রাচীন কৃষ্ণনগর, চৈতন্যদেবের নবদ্বীপ এবং অর্ধশত গোস্বামীর শাস্তিপুর তথনি মানস নেত্রে প্রতিভাত হইয়া অতীত গৌরব স্মৃতি আগাইয়া তুলিল। গ্রন্থ পাঠে জানা আর চক্ষে দেখিয়া অভিজ্ঞতা লাভ স্বতন্ত্র। শীত ঋতুর অবসানে যেমন বসন্ত, তেমনি কৈশোরান্তে যৌবন সমাগমে মহুশ্য জ্বলে নানাবিধ ভাবোদয়, প্রকৃতি রাজ্যে বাহা আছে কিবা নাই তাহা কল্পনায় সৃষ্টি করিয়া এককে শত গুণে বাড়াইয়া পরিতৃপ্ত হওয়া যায়। এ কৃষ্ণনগর গমনও আমার পক্ষে সেই প্রকার নব উপস্থানের প্রথম প্রেম কাহিনীর স্রায় মোহময় হইয়াছিল।

সে সময় রেলপথ ছিল না, অশ্ববানে যাইতে হইত, আমরাও সেই উপায় অবলম্বন করিয়া পশ্চিমধ্যে কুমুদের জলধান ও আমাদের শৈশব স্মৃতি বনগ্রামে প্রদ্বাদশ ৬ত্রিশচন্দ্র বিচারতন্ত্র মহাশয়ের গৃহে যাইয়া উপনীত হইলাম। বিপত্নীক গৃহস্বামী আমাদের স্তুতিধার জন্ত সমস্ত ছাড়িয়া দিয়া অল্প অল্প লইলেন। তাঁহার পিতৃবৎ স্নেহ, মমতা, আদর, আপ্যায়ন সমভাবে পাইয়াও গৃহলক্ষ্মীর অভাবটা বড় মনে হইত। মা ছদ্মবেশে সেই শূন্য ভবন মাতৃস্নেহে পরিপূর্ণ করিয়া সর্ব দুঃখ মোচন করিয়াছিলেন। সে ছদ্মবেশের আনন্দ উৎসব স্রোতগণের ক্রীড়া হাস্য অভ্যাকার নিরানন্দ জীবনের নিত্য স্মরণীয়। বাহা ছিল তাহা নাই বলিয়া কাঁদিতে পারি তথাপি স্মৃতি মুছিয়া ফেলিতে চাহি না।

“It is better to have loved and lost than never to have loved at all.”

কৃষ্ণনগর প্রথম পরীক্ষণের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ক্রীড়ান নাম রটিয়া চাকর দাসী ও পাচক ব্রাহ্মণ পাওয়ার বড় গোল হয়। এ অনর্থক মূল ধর্ম না, আমাদের পায়ের উপানং। একে নবাগত, তাহাতে কতক বিদেশী চাল চলন, কাজেই আরম্ভটা তেমন স্তুতিধারজনক বোধ হয় নাই। ক্রমশঃ আলাপ পরিচয়ে সর্ব অসুবিধা তিরোহিত হইয়া যায়। বাইবার দিনই সন্ধ্যা হস্তে বাচক উপযাচকের হল, কার্যপ্রার্থী, একে একে, হুঁরে হুঁরে, আসিয়া বাহার বা অভিল্য ও বাক্য জানাইতে লাগিল, তাহাদিগের মধ্যে নতুন দেখিলাম ভাস্কর বাবু বাহক স্বর্কে

ও নবদীপে অস্তিম রাজ্য করাইবার জন্য জন্মগ্রহণী “মুর্দাফরাল”। তিকিৎসক এবং তাহার পরেই শববাহক, ইহাতে ধ্বংসরীর হাত বশের প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া বাইতেছে, তাহার রোগীর শেষ গতি জাহ্নবী তীর।

“ধরণীদেবর কৃষ্ণচন্দ্রের” রাজধানী কৃষ্ণনগর দিবা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ছোট খাট নগর। প্রকৃতির শ্রামল তরু লতার ও বৃহৎ বৃহৎ উচ্চ বৃক্ষে রাজপথ ছায়ায়। “কোম্পানীর বাগান” আশ্রয় কানন শোভার সদন, সেখানে দিবা দ্বিপ্রহরে কি সাগরকের গোয়ালি রাগ রঞ্জিত আকাশতলে উপবেশন বা শয়ন করিয়া কল্পনার স্বপ্ন রাজ্যে বিচরণ করিতে করিতে মনুষ্য জীবনের স্বপ্ন ছুঃখ, হর্ষ বিষাদ একাকার হইয়া যায় ও অন্তরে গভীর শান্তি আনয়ন করে। এমন নির্জন নিম্নতর ভাব এমন ললিত বিহঙ্গ গীতি, এমন স্বভাবের মুক্ত সৌন্দর্য্য আমরণ ভোগের জন্য বিধাতাই যেন ধরাতলে অভিনব মায়াবাজ্য সৃষ্টি করিয়াছেন।

কৃষ্ণনগর আসিয়া আমাদের গায়ে যথার্থ বন্ধুলাভ হইয়াছিল, তাঁহাদিগের স্নেহ প্রীতি ভালবাসায় জীবনকে সর্ববিষয়ে কেমন পরিপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছিল। পিতৃহৃদয় পূজ্যতম দেওয়ান খানজাহাঙ্গীরের রায়, কালীচরণ লাহিড়ী ও ঋষি-প্রতিম রামতল্লা বাবু আদর্শ চরিত্রবান মহাপুরুষ। দেওয়ানজী মহাশয় একদিকে যেমন কাব্যাহুরাগী ও সুগায়ক অন্তর্দিকে আবার তেমনি রাজদরবারে উচ্চহান অধিকার করিয়া বসিতেন। তাঁহার সব স্বপ্নের ছিল, তাঁহার গৃহ, পুষ্পোচ্ছান আশ্রয়কানন ও লতাভূষণ একটা দর্শনীয় বস্তু। তাঁহার বাড়ীতে ঘাইয়া প্রথমেই তাঁহার সহস্র প্রীতিপূর্ণ মুখ দেখিয়া দিনটা সার্থক হইয়া বাইত। তাঁহার অল্প সব পুত্রগণের সৌজন্য এবং সুকণ্ঠ “কুমার যুগল” “হরু” (শ্রীমান হরেন্দ্রলাল রায়) “বিজয়” (শ্রীমান বিজেন্দ্রলাল রায়) \* মধুর সঙ্গীত শ্রবণ ও তাঁহাদিগের সরল। স্নেহময়ী জননীর অল্পশ্রম স্নেহের প্রিয়বাক্য, সেই সঙ্গে অকৃত্রিম আতিথ্য ইহ জীবনে ভুলিতে পারিব না। তাঁহাদের সাত ভ্রাতার একমাত্র ভগিনী, স্বপ্নরী সুলীলা মালতী পিতৃগৃহ আলো করিয়া থাকিত। তাহার সেই বাল্যের ঘুলিখেলা, কৈশোর সমাগমে স্বপ্ন পরিণয় ও যৌবনের মহাযাত্রা এই তিন অঙ্গই চক্রে সম্মুখে অভিনীত হইয়া গিয়াছে। মালতী পিজালয়ের শ্রী সৌষ্ঠব বিলুপ্ত প্রায় করিয়াছে, দেওয়ানজী মহাশয়ের লোকান্তর গমনের সহিত তাঁহার সাধের পুষ্প-বীথিকায় তেমন বসোরা গোলাপ আর প্রফুল্লিত হয় না, পল্লবিত দেবদারু বৃক্ষের শাখায় প্রচ্ছন্ন বসিয়া কোকিল দ্বয়েল পাশিয়া ও বৌ কথাকও ললিত ভৈরবী গাহিয়া চিত্ত মুগ্ধ করে না। তাঁহার স্বহস্ত রোপিত আম্রবৃক্ষে তেমন উপাদেয় মধুকল আর বেন ফলে না। আছে সবই, কিন্তু তাঁহার অভাবে কিছুই

\* বিজয় জীবিতকালে তাহার বিবর লিখিয়াছিলাম। অল্প তাহা শোকের গভীর চিহ্নধারণ হইয়াছে। তিনি একদিন ইহা শুনিতে আসিবেন কথাও ছিল, কিন্তু অসময়ে অকালে তিনি চলিয়া গিয়াছেন, তাঁহার ও আমার সে আশা পূর্ণ হয় নাই, এই আরো গভীর দুঃখ।

আর তেমনটা নাই।

“কান্তিকের চন্দ্র রায় অমাত্য প্রধান  
স্বপ্নের স্বপ্নীল শান্ত বদান্ত বিদ্বান,  
স্বপ্নের স্বপ্নে গীত কিবা গান তিনি  
ইচ্ছা করে শুনি হয়ে উজান বাহিনী।”

“স্বপ্নধূনী কাব্যের” ভাগীরথী পতিতপাবনী হইয়াও তাঁহার গীত শুনিবার জন্য আবার “উজান বাহিনী” হইতে চাহিয়াছিলেন। আমরা ত দুর্বল মনুষ্য, তাঁহার স্বপ্নের মুখের সেই অমর সঙ্গীত কিরূপে বিন্ধিত হইব? যিনি একবার মাত্র সে স্বপ্নগীতি শ্রবণ করিয়াছেন তিনি ইহজন্মে তাহা কখন আর ভুলিতে পারিবেন না। এই কান্তিকেরচন্দ্র রায় মহাশয়ের সর্ব কনিষ্ঠপুত্র, শ্রীমান দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। ভ্রাতাগণের সহপাঠী শৈশব সহচর এবং অঙ্ককার বন্ধু। “দ্বিজু” এক্ষণে কবি, নাট্যকার, ব্যঙ্গরসিক, হাসির গান রচয়িতা সাহিত্য ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠাবান বড় লোক, তবু আমাদের নিকটে আজও পূর্বের সেই “দ্বিজু”। তাহার বাল্য রচিত

“জানি না জননী কেন এত ভালবাসি ?

হৃৎকের তাড়নে মোর হৃদয় ব্যথিত হলে

জানি না তোমার ( ই ) কাছে কেন ধৈর্য আসি ?”

সর্বশ্রেষ্ঠ গান। তাহার পুণ্যবতী মাতৃদেবী এই সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া স্নেহ বিগলিত প্রাণে প্রিয়তম পুত্রের গাজে কল্যাণ হস্ত বুলাইয়া আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতেন। সেই মাতৃ আশীর্বাদের অক্ষয় ফলস্বরূপ আজিকার “আমার দেশ” ও “জন্মভূমি” জীবন্তকালের ধারণ করিয়া মাতৃপদে অঞ্জলি দান করিতেছে :

“পরম ধার্মিকবর এক মহাশয়,

সত্য বিমণ্ডিত তাঁর কোমল হৃদয়,

সারল্যের পুস্তলিকা পরহিতে রত,

স্বপ্ন দুঃখ সমজ্ঞান ঋষিদের মত,

জিতেন্দ্রিয় বিজ্ঞমত বিশুদ্ধ বিশেষ,

রসনায় বিরাজিত ধর্ম উপদেশ,

একদিন তাঁর কাছে করিলে যাপন,

দশদিন ভাল থাকে দুঃখিনীত মন,

বিদ্যা বিত্তরূপে তিনি সদা হরষিত,

নাম তাঁর “রামতত্ব” সকলে বিদিত।”

এই জগৎ বিখ্যাত মহাত্মা রামতত্ব লাহিড়ী মহাশয়ের তৃতীয় কন্যা কণ্ঠস্থিত। শব্দভারুপিণী ইন্দুমতী পিতৃদেবের তপোবনের জীবন স্বরূপা ছিলেন। সেই সলজ্জ শান্ত মুক্তি, সর্বদা স্বপ্নের বনলতা, উজানলতাকে রান করিয়া আশ্রমের

শোভা সম্পাদন করিতেন। শাপড়ট দেববালা পারিবারিক ও অশান্ত ভ্রাতৃসেবার আত্মসমর্পণ করিয়া অকালে দিব্যলোকে চলিয়া গিয়াছেন। মহুত্তরজীবন ভোগের জন্ত নহে, শুধু ভ্যাগের জন্ত, পরার্থপরতার বোবনের সমস্ত সুখাশা প্রথম প্রীতি বিসর্জন দিয়া ভগৎকে কেবল কর্তব্যকার্যে উচ্চতর ভালবালা শিক্ষা দিবার নিমিত্তই তাঁহার মহিমময়ী নারীজগৎ গ্রহণ। সেই ঋষিভনয়া কুমারী ইন্দুমতীর সহিত প্রথম সন্দর্শনে আমার তরুণ হৃদয়ের যেন শুভদৃষ্টি হইয়াছিল। বোবনের প্রারম্ভে অপরিষ্কৃত মানসিক বৃত্তিগুলির সম্যক বিকাশ কিছু ছিল না, বিনিময়ের মাধুরী বুঝিতাম না, ভালবাসার প্রতিদানে আবার যে তাহা পরিপূর্ণ করিয়া দিতে হয় তাহাও জানিতাম না। আত্মার বাস্তবিক পূর্ণতা দানে, গ্রহণে নহে। পিতৃ মাতৃ স্নেহজীবিত ও ভ্রাতাগণের বাল্য বন্ধুত্ব যে জীবনের সঞ্চল ছিল, পরিজন মধ্যে কেন্দ্রীভূত সীমাবদ্ধ ভালবাসায় নিজের পৃথক অস্তিত্ব না থাকায় এই নবীন বন্ধুর প্রতি প্রেমাত্মরূপের শ্রোতে চিত্ত একেবারে ভাসিয়া গিয়াছিল। সে যে কি অপূর্ব আত্মবিস্মৃতি এখন তাহা বলিয়া বুঝাইতে পারি না। প্রভাত হইতে সায়াহ্ন এবং দ্বিতীয় প্রহর রজনী কথায় কথায় এই দীর্ঘ সময় কোথায় দিয়া যে চলিয়া বাইত বুঝিতেও পারিতাম না। সে কোন রাজনৈতিক গুপ্ত পরামর্শ, কিবা বৈজ্ঞানিক নূতন আবিষ্কার চেষ্টার আলোচনা নহে, ইহাতে কেবল সংসার অনভিজ্ঞ উভয় জীবনের অতৃপ্ত আশায়, — নৈরাশ্র কাতরতা, কল্পনার মোহমগ্ন, সেই অভিনব সৃষ্ট রাজ্যের সমগ্রভাবসমূহ ও নব দৃশ্যপট সব মানসজাত, বাস্তবস্তর সঙ্গে সঙ্ঘর্ষ বিরহিত। বোবন বসন্তের সমাবেশে প্রত্যেক মহুত্তরজীবনের এইরূপ টলমল অবস্থা ঘটিয়া থাকে। আশায় নৈরাশ্র, দানে প্রত্যাখ্যান, ও দাত প্রতিবাতে ক্রমশঃ যে জ্ঞানোদয় হয় তাহাতেই হৃদয়ের সম্পূর্ণ পরিণতি হইয়া আমরা সত্যকার মহুত্তর নামের যোগ্য হই।

ভগবন্তক “রামতলু” ইহলোকে প্রাণাধিক জ্যেষ্ঠ পুত্র আদর্শ কস্তার অকাল মৃত্যুশোক গভীর বিশ্বাস বলে পরাজয় করিয়া এক্ষণে চিরশান্তি লাভ করিয়াছেন। তাঁহার কৃতী পুত্র শ্রীমান শরৎকুমার লাহিড়ী ( Mr. S. K. Lahiri ) \* অধুনা পিতৃ বংশের গৌরব রক্ষা করিতেছেন। এই লাহিড়ী মহাশয়েরই সর্ব কর্ণিষ্ঠ সহোদর ডাক্তার কালীচরণ লাহিড়ী, একাধারে কবি এবং কবিরাজ, সুদক্ষ চিকিৎসক, তিনি পরোপকারী ও অতিশয় বন্ধুপ্রিয় ছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে এ কবিতার প্রত্যেক বাক্য জাজল্যমান সত্য।

“করিলাম তারপরে স্তখে দরশন,  
আনন্দ প্রফুল্ল মুখ ভিষক রতন,

\* পরন্তু আর ইহলোকে নাই। “পূর্বকথা” স্রষ্টাভাতে যখন বাহির হয় তখন তিনি জীবিত ছিলেন।

হৃদয়ভর সরলতা মাথা কলেবরে,  
 ভাসিতেছে চিস্তা তাঁর দয়ার সাগরে,  
 অকপট পিরীতের পবিত্র আধার,  
 স্থলমিত রসনায় স্থা অনিবার ।  
 দীন দুঃখী তাঁর কাছে আদর ভাজন,  
 দেখেন তাদের সদা করিয়ে বতন,  
 বিনা মূল্যে বিতরণ ভাবুক ভেষজ,  
 বিকশিত বাতে তাঁর হৃদয় পঙ্কজ ;  
 ধনীতে কাকন দেয়, দীনে আশীর্বাদ,  
 তাতেই তাঁহার মনে বিমল আছাদ,  
 কেমন স্বভাব তাঁর, মধুর বচন,  
 ছেলেরা আনন্দে নাচে পেলে দরশন,  
 ছেলেদের কালী বাবু, ছেলেরা কালীর,  
 উভয়েতে মিলে যায় যেন নীরক্ষীর ।

( স্বরধুনী কাব্য )

কুশনগর দীর্ঘ প্রবাসের দৈনিক ইতিহাস ও প্রত্যেক বন্ধুর অকপট স্নেহ ভালবাসা এক এক করিয়া বলিতে গেলে জীবন নাট্যের দশম অঙ্কেও তাহা পরিসমাপ্ত হইবার নহে, আবার কিছু না বলিয়া নীরব থাকিলেও ঘোরতর অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ পায়, উভয়সঙ্কট, স্তরাতঃ বথাসাধ্য চেষ্টার কোন প্রকার ফলি হইবে না, ইহা স্থির নিশ্চয় ।

সেখানে বাসকালীন নদীয়া রাজ্য অন্তঃপুরিকাঙ্গিরের সহিত চাক্ষুষ আলাপের সৌভাগ্য কখন অদৃষ্টে ঘটিয়া উঠে নাই । তবে মহারাজা ৬শ্রীশচন্দ্র রায় বাহােরের হুকুম কালীকুমারী দেবীর সঙ্গে দৈবাৎ পরিচয় হইয়া এমন একটা ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা হইয়াছিল যে তিনি আমাদিগকে স্বীয় সন্তানের জায় স্নেহ সমতা করিতেন । আমাকে “মেয়ে” সখোথনে কত আদর বস্তু দেখাইতেন, নাম ধরিয়া ডাকিতেন না, সেটা তাঁহার নিকট অসম্মান সূচক মনে হইত । মাতা কালীকুমারী দেবী অতি সরলা, স্বজন বৎসলা ও অনাথ দুঃখীর মাতৃহানীয়া ছিলেন । তাঁহার ঘারে নিত্য সদাভ্রত চলিত । কত কত নিরাশ্রয়া বিধবা তাঁহারই স্নেহাশ্রয়ে থাকিয়া নিরাপদে ধর্মকার্য্যে জীবন অতিবাহিত করিয়া গিয়াছে, একটা দিনের জন্য কোন রূঢ় বাক্য তাঁহার মুখে শুনিতে হয় নাই । রাজকুমারীর ধনগর্ভ, বুধা বংশ মর্যাদার চিহ্ন ভিতর বাহিরে ছিল না, মানসিক উচ্চতায় তিনি স্বার্থ রাজীবৎ থাকিয়া বংশ গৌরব রক্ষা করিয়াছিলেন ! তাঁহার অন্তর্গানে কুলীন ব্রাহ্মণ রাজজামাতার সর্বস্ব, ধন মান বিষয় বৈভব কোথায় দিয়া যে উড়িয়াপুড়িয়া গেল তাহার তথ্য খুঁজিয়া পাওয়া যায় না । তাঁহারই



একমাত্র পুত্র লোকরঞ্জন শ্রামাধব “রায়বাবু”\* বড় অমায়িক পরোপকারী ও স্বয়ংসিক ছিলেন। তাঁহার রহস্যজনক এক একটা কথায় ও গল্পে মজলিসে হাতের ডরঙ্গ বহিয়া বাইত। কোন সময় রেলগাড়ীতে কৌতুহলাক্রান্ত এক ব্যক্তি তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেন “নাম শ্রামাধব রায়, পিতৃনাম অঘোরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়”। তাহাতে ভদ্রলোকটি পরিতুষ্ট না হইয়া আবার বলেন “এ কিরূপ মহাশয়, মুখ্য্যার ছেলে, রায় ?” উত্তর, “অমন হয়ে থাকে, কি করা হয় ?” “কিছু না”, “চলে কিসে ?” “চুরী ব্যবসায়।” তখন গাড়ীর মধ্যে অল্প সব ভদ্রলোক লজ্জায় অধোমুখ হইয়া রহিল এবং কৌতুহলী ভদ্র সন্তান, সতীশচন্দ্র মহারাজের ভাগিনের “রায়বাবু” বৃত্তিতে পারিয়া করবোড়ে কমা প্রার্থনা করিলেন। “রায়বাবু” একটা বি, এ উপাধিধারিণী মহিলার ইংরাজী বলার গন্ধিত ভাব ও প্রগল্ভতায় আমোদিত হইয়া আমাদের নিকট আসিয়া পরিস্কারকূলে বলিয়াছিলেন “অমুক খুব শিক্ষিতা ও ইংরাজী “Bosh” বস্ টস্ বলিতেছে, এই ত শিক্ষা, আপনারা কেহই তাঁহার কাছে লাগেন না।”

ইলবার্ট বিলের দেশব্যাপী আন্দোলনের সময় অনেক রাজা মহারাজাগণের পৃথক পৃথক মত লওয়া হয়। তখন রাজ ভাগিনের রায়বাবুকে ছোটলাট সন্মানে লইয়া মতামত জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, তিনি নিতান্ত নিরুপায় অবস্থাপন্ন ভাবে প্রকৃত মত গোপন রাখিয়া বলিয়াছিলেন “আমি চির বোকা তাহা ত আপনি জানেন, কলেজে অতি পরিশ্রমেও এফের উপরে উঠিতে পারি নাই, আপনারদের দ্বায়্য এখন ডিপুটী, তবুও প্রমোশনের আশা নাই। শুধু আমারই বুদ্ধি কম তাহা নহে, মাতুল বুদ্ধিহীন, মাও তেমনি, এমন বংশের আবার মত লইয়া কি হইবে ?” তাঁহার এই কথায় ছোটলাট অতিশয় হাস্য সহকারে বলিয়াছিলেন “ই ঠিক কথা, তুমি স্থূলী রাজকন্ডা কালীকুমারীর নির্বোধ ছেলে শ্রামাধব। কলেজে কখন প্রাইম পাইতে দেখি নাই। রাজ মাতার আত্মরে বোকা নাতি।” এই মাতা পুত্র উভয়েই অল্প লোকান্তরে। তাঁহাদের বংশ লোপ হইয়া গিয়াছে। নিঃসন্তান রায়বাবুর ছুঃখিনী বিধবা জীবিত আছেন মাত্র। লোকে কথায় বলে “সে রায়ও নাই, সে অধোধ্যাও নাই, আছে কেবল হায় হায়”; এও তেমনি আজ কাল।

এই কৃষ্ণনগরেই খ্যাতনামা স্বর্গীয় মনোমোহন ও লালমোহন ঘোষ মহাশয়-দ্বিগের পরিবারের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হইয়াছিল, তাঁহাদিগের প্রত্যেকেই আমাদের পরমাত্মীয়, ঘোষ মহাশয়দ্বিগের মাতৃদেবী স্নগৃহিণী এবং সর্বোংশে আদর্শ নারী ছিলেন। বুদ্ধি বিবেচনা সামাজিক লোক লৌকিকতা আদান প্রদান দৈনিক বখাযোগ্যরূপে নির্বাহ করিতেন, কোন কার্যে ত্রুটি দেখা বাইত না।

\* নবীরা রাজবংশের ভাগিনার উপাধি “রায়বাবু”, তিনিও সেইজন্য সর্বজন পরিজাত রায়বাঈ নামেই খ্যাত ছিলেন। শ্রামাধব কেহ বলিত না।

দয়্যাবতী পরহুৎখাতরা মাতা দানে মুক্তহস্ত থাকার তাঁহার আশ্রয়ে কত দরিদ্র বালক প্রতিপালিত হইয়া কালেজে অধ্যয়ন করিয়া পরে জীবিকা উপার্জনে কৃতকার্য হইয়াছিল। কত নিরন্ন অনাথকে অন্নবস্ত্র দিতেন, অতিথির জন্ত তাঁহার সৌধবার সতত বিযুক্ত থাকিত। সেকালের দিনেও বুদ্ধ সদরওয়ালারায় রামলোচন ঘোষ বাহাদুর রীতিমত মাঠার পণ্ডিত চিত্রকর রাখিয়া দ্বিতীয় পক্ষের বালিকা পত্নীকে সুশিক্ষিতা করিয়াছিলেন, সময়োচিত লেখা পড়া দিয়া জানিতেন। হস্তাক্ষর ছাপার জায় স্থান ছিল, শিল্পকার্যে চিত্রাঙ্কনে, নারিকেলের বিবিধ মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিতে সিদ্ধ হস্ত ছিলেন। এমন গুণবতী মাতার গুণগ্রামেই ঘোষ ভ্রাতারয় চিরস্মরণীয়। মাতৃভক্তি মাতৃসেবা মাতৃসদ স্মৃতি লাভই তাঁহার পুত্রগণের সার ধর্ম ও নিত্য আরাধনা স্বরূপ ছিল। তাঁহাদের মাতা পুত্রের স্নেহের সন্মিলন ঘেন ধমুনা জাহ্নবীর সঙ্গের তুল্য পবিত্র ও সে দৃশ্য দেখিয়া নয়ন মন জুড়াইয়া বাইত।

ঘোষজননী অতীব মমতার চক্ষে আমার সবই সুন্দরতর দেখিতেন এবং আমাকে বড় ভালও বাসিতেন। তাঁহাতে ও আমাতে হৃদয়ের এমন একটা গভীর বন্ধন ছিল যে উভয়ে উভয়ের ভালবাসার মর্যাদা অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে অহুভব করিতাম। তাঁহার কল্পা ও বধুগণের সহিত আমার চিরবন্ধুতা, সেই প্রথম যৌবনে যে সৌরভ জন্মিয়াছে আজি পর্যন্ত তাহার বিন্দুমাত্র হ্রাস হয় নাই। তাঁহার মধ্যম পুত্র বধু ৬লালমোহন ঘোষ মহাশয়ের সাধী পত্নী স্বর্গার্য বরদাসুন্দরী সর্বদিকে অতুলনীয়, তাঁহার অসীম পতিভক্তি, স্বজন স্নেহ, বন্ধু-প্রীতি, স্ননিপুণ গৃহিণীপনা ও দেবভোগ্য উপাদেশ রন্ধন অহুৎকরণীয়। সদানন্দ হান্তময়ী সোদরা প্রতিম “মেজ বোএর” অকাল মৃত্যুর বিচ্ছেদ ব্যথা ইহজন্মে আর তুলিতে পারিব না। পতিব্রতা সতী এক্ষণে পরলোকে স্বামীর পার্শ্বে শান্তি লাভ করিয়াছেন। আমরাই কয়জন সুহৃৎরা “বড় বধু” শ্রীমতী স্বর্ণলতা ঘোষ (Mrs. M. Ghose), স্নেহময়ী সহদয়া “ললিতমণি হিদি” ও প্রিয় ভগ্নী লালমণি শোক ছুখে বাঁচিয়া আছি।

অপ্রাপ্ত বয়সের জন্ত আশুর প্রবেশিকা পরীক্ষার কাল বিলম্ব হইয়া গিয়াছিল। সেই কয়েক বৎসর কালেজ লাইব্রেরীর কাগজপত্র গ্রন্থ সব তাহাকে অমনি পড়িতে দিত ও দয়ালু প্রিন্সিপাল মিঃ রো বালকের প্রতিভার মর্যাদা বুঝিয়া সাপ্তাহিক ছাত্র সভার অধিবেশনে তাহাকে প্রবন্ধ লিখিতে দিতেন, তাহা অল্পাপি কালেজ ক্যালেগারে মুদ্রিত রহিয়াছে। সেই সভার শাখা সমিতি প্রতি রবি-বারে আমাদের গৃহে বসিত। বঙ্গ সাহিত্যের অধিকাংশ পুস্তক সেখানে পাঠ আলোচনা ও সেই সব গ্রন্থের সমালোচনা প্রবন্ধাকারে লিখিত হইত। সভার সকল সভ্যই ছাত্র এবং আমিই একমাত্র মহিলা সভ্য ছিলাম। “মাইকেল”, “হেমচন্দ্র”, “রত্নলাল” (স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে, কে বাঁচিতে চায়,

কবিতার রচয়িতা), শেলী বাইরণ ওয়ার্ডসওয়ার্থ কবিগণের কবিতা মুখস্থ, তাহার অনুকরণ বা কথায় কথায় অনুবাদ করা হইত, “ভারত সঙ্গীত” “ভারত বিলাপ” আবৃত্তি চলিত। পিতৃদেব আমাদিগকে সমবেত আত্মীয়গণের সম্মুখে, দণ্ডায়মান করাইয়া তাহা বলাইতেন এবং তাঁহারিও একবাক্যে প্রশংসা করিয়া, উৎসাহ বর্দ্ধন করিতেন। এই পারিবারিক সভায় বঙ্কিমচন্দ্রের বাবতীয় উপস্থান সঙ্গীত বাবুর “কণ্ঠমালা” ও পূজ্যপাদ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সমগ্র গ্রন্থাবলী এবং জ্ঞানী অক্ষয়কুমার দত্তজ্যার “বাহুবল্লভ সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার” প্রভৃতির চর্চা, ও দুরূহ শব্দের অর্থ করিয়া অধ্যয়নে আশাতীত ফল পাইয়া-ছিলাম। সেই পূজ্য, বাগ্বেদী সুপ্রসন্ন হইয়াছিলেন বোধ হয় এবং তাঁহারই বরে সেই বয়সে যে সব কাব্য ইতিহাস, গল্প পল্প পড়িয়াছিলাম তাহাতে জীবন-গঠিত হইয়া উঠিয়াছে ও তাহাই অজ্ঞকার মানস সম্বল।

আমাদিগের দুর্ভাগ্যবশতঃ পিতৃদেবকে আবার মেহেরপুর সবডিভিসানে বদলী করা হইল ও আমার পাঠের সাহায্যার্থে মিশনরী মেম নিযুক্ত করিয়া দিলেন। তাঁহাদিগের ইংরাজী পাঠ অধিকাংশই বাইবেল হইতে ও বিষ্ণু ভক্তনার নিগূঢ় তত্ত্ব শিক্ষা। এবার পাঠের সঙ্গে গিয়ানো শিখিতে আরম্ভ করিয়া চঃ চঃ বাস্তব অভ্যাসের গভীর নিনাদে গৃহবাসীগণের দিবা নিদ্রায় বিঘ্ন ঘটাইতে লাগিলাম। এত পরিশ্রমের সঙ্গীত বিজ্ঞার সফলতা নিফল হইয়া গিয়াছে।

মিশনরী রমণীর নিকট আমার ইংরাজীপাঠের মন্থর গতি দৃষ্টে স্বইচ্ছা প্রণোদিত জনৈক আত্মীয় আমাকে পড়াইবার ভার গ্রহণ করিলেন। প্রোফঃ গুরুজী সুপক্ক আত্ম বিশেষ। মস্তকের মধ্যস্থল একেবারে কেশ শূন্য, চারিপাশের যে কয়েকটা ছিল তাহা অতি যত্নে সুগন্ধ তৈল রঞ্জিত করিয়া চোগা চাপকানে সজ্জীভূত শিক্ষক মহাশয় নিয়মমত আমাকে পড়াইতে আসিতেন। তাঁহার চোটা প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করান, আমারও যত্নের ফলটি ছিল না, ঘটনায় অন্তরূপ হইয়া গেল, “যত্নে ক্রতে বহি ন সিদ্ধতি কোত্র দোষঃ।” শৈশবে কতকগুলি কবিতা লিখি, “তাঁহার গল্প পল্প কেবল চৌদ্দে জানা” গিয়াছিল কিন্তু পিতৃ মেহের আধিক্যে তাহা আবার পুস্তকাকার ধারণ করিয়া বন্ধু বান্ধবদিগের কাছে আদর পাইয়াছিল, তাহার নাম “আধ আধ ভাবিণী”। পূজনীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিতেন “অমৃতং বালভাবিতং”, সে বতই অমৃত হউক, অস্তিত্ব সমূলে বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছে। মাতা বীণাপাণির মধুর বীণা-বস্তু হস্তে কিছা কণ্ঠে কখন বাজে নাই, তবে তাঁহার আশীর্বাদ অল্পরক্ত ভক্তের উপর বর্ষিত হইয়াছিল, তাহারই নিদর্শন “বনলতা” ও “নীহারিকা,” প্রথম, দ্বিতীয়ভাগ, “আর্য্যাবর্ত্ত” এবং “অশোকা”। সেকালে জীশিক্ষার বহুল প্রচার না থাকায় শিক্ষিত সমাজের ভিতর আমাদিগের খুব মান সম্মান ছিল। প্রবীণ সাহিত্যিকার শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় উপাচ্যক হইয়া আমার সঙ্গে আলাপ করিতে কৃকনগর

আসিয়াছিলেন।

তখন আশু কিশোর বয়স্ক, আশিও ছোট। তাঁহার সেই আগমনে আমার অপার আনন্দাহুভব করিয়াছিলাম। তিনি বহু সম্মান দেখাইয়া বলিয়াছিলেন “বিদ্বী বঙ্গমহিলাকে আমার সাধারণীর সংবাদদাত্রী হইতে অস্বরোধ করিতে আসিয়াছি।” তাঁহারই বস্তু আমার কবিতা প্রতি সপ্তাহে “সাধারণীতে” স্থান প্রাপ্ত হইয়া গুণগ্রাহী পাঠকগণের হৃদয় আকর্ষণ ও হৃৎযান্ত্রি লাভ করে। সিরলা শৈলবাসী একজন অজ্ঞাত বন্ধু কবিতা পাঠে আমার প্রতি মাত্ত প্রকাশ করিয়া লিখিয়াছিলেন—

“প্রসীদ প্রসন্নময়ী ভারত তনয়ে,  
হের মা নয়নে তুমি,  
দুঃখিনী জনম তুমি,  
তুমি কল্পা মাতৃসেবা করো অনিবার।”

“সাধারণী”র কল্যাণে আমার রচনা সাহিত্যিকদিগের নিকট প্রশংসা পাইয়া “নীহারিকায়” পরিষ্কৃত হয়। তাহার অনেক প্রীতিকর \* সমালোচনাও বাহির হইয়া বঙ্গীয় পাঠক মণ্ডলীর দ্বারা আদৃত হইয়াছিল ও তাহাতে আর কিছু হউক না হউক, মৃত্যুকালের ব্যয় ভার বহন করিতে হয় নাই। সৌভাগ্যবশতঃ পুস্তকগুলি বিক্রয় হইয়াছে। যে দেশে চাহিয়া লইয়া পড়া রীতি কখন বা পুস্তক “আত্মবৎ পর-দ্রব্যেয়” করিয়া “বহুধৈব কুটুম্বকং” জানে তাহা প্রত্যর্পণ করিবার ইচ্ছাও থাকে না, সে দেশের বিড়ম্বিত গ্রন্থকারগণের প্রতি কমলার কৃশাদৃষ্টিপাত সময় সাপেক্ষ।

মাহেন্দ্রকণে বঙ্গদর্শনের আবির্ভাব। কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধের রণভেরী শ্রবণে সমবেত রাজকুমার, ভীষ্ম, দ্রোণ, ভীমার্জুন, কর্ণ, দুৰ্যোধন প্রভৃতির অপ্রতিহত বীরত্ব ও যুদ্ধ কোশলে যেমন নবযুগের অবতারণা হইয়াছিল এও সেইরূপ সাহিত্যের সত্য যুগোৎপত্তি। এ সংগ্রাম নহে, এ সন্ধি, বিদ্বজ্জন সমাগম মাতৃ-পূজার মহোৎসব, বাণীর বরপুত্র বক্ষিমচন্দ্রের সারথ্যে বঙ্গসাহিত্যের জয়, বঙ্গদর্শনের শুভাগমন। প্রতিভাশালী এতগুলি মাতৃ-সেবকের একত্র সম্মিলন সচরাচর দৃষ্টিগোচর হয় না। মায়াপুরীর অপূর্ব কাহিনী “বিষবৃক”, “কৃষ্ণকান্তের উটল” ও “কমলাকান্তের দপ্তর”, রাজকৃষ্ণের অকর্ণকিরণময়ী “উবা”, ফুরফুরে বসন্ত বায়ুর জ্বায় দীনবন্ধুর “রাত পোহাল, ফর্সা হলো, ফুটলো কত ফুল”, চন্দ্রশেখরের বৈরাগ্যোদ্দীপক “শ্রাশান”, হেমচন্দ্রের কোবল “বঙ্গনারী”, অক্ষয়ের বিচিত্র “গ্রাবু”, এবং চন্দ্রনাথের “শকুন্তলা তব” বাগেদবীর পূজোপচার পাশ্চ, অর্ঘ, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য বিশেষ পুষ্প চন্দ্রনের সৌরভিত অপাধিব উপকরণ সব

\* সরকার মহাশয় “নীহারিকা” সমালোচনার লিখিয়াছিলেন, “চন্দ্রক দেখিতে গেলে “নীহারিকা” ছায়াবরী, দুর্বাচরণের মর্গকে দেখিতে গেলে “নীহারিকা” কায়ামরী।”

হাতা সরবতীর পানপান সমুজ্জল করিয়া এমনি রহিবে, কালের চকল গভীর সহিত কখন ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে না। “বঙ্গদর্শন” গিয়াছে, তাহার শক্তিসম্পন্ন অধিতীয় লেখকগণের অধিকাংশ অন্য লোকান্তরে, কিন্তু তাঁহাদিগের অলৌকিক অমরপ্রতিভা চির-জীবন্ত, কখন বিলুপ্ত হইবে না।

“বঙ্গদর্শনের” নবযুগে পরস্ব অপহারক গ্রন্থকারগণের সমূহ বিপদ ছিল। সাহিত্যগুরু বঙ্কিমের তীব্র বিজ্ঞপাত্তক সমালোচনায় কে কোথায় যে অন্তর্ধান হইয়া গিয়াছে তাহাদের প্রেতাশ্মারও আর দর্শন পাওয়া যায় না। গাজলার জনৈক রসিক গ্রন্থকার বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি কটাক্ষ করিয়া পুস্তকের নাম দিয়াছিলেন “ডিপুটা বিভূতি বোগ”। তিনিও তাহার এক ছত্রে দিব্য সমালোচনা করিয়াছিলেন, “পুস্তিকা হস্তিকা রোগ”। মাইকেল দত্ত তাঁহার চতুর্দশপদী কবিতাবলীতে কোন এক পুস্তকের সমালোচনায় লিখিয়াছিলেন “চণ্ডালের হাত দিয়া পোড়াও পুস্তকে, করি ভস্মরাশি, ফেল কর্মনাশা জলে,” ইহাতে তাঁহার অনেকখানি ক্রোধের ব্যয় হইয়া গিয়াছে, কিন্তু স্থির গভীর অটল বঙ্কিমচন্দ্র শরীর ও মনের কোনখানে কিছু স্পর্শ করিতে না দিয়া এমন মর্শ্বেদনী সমালোচনা করিতেন যে বঙ্গ ভাষায় তাহার দ্বিতীয় দেখিতে পাওয়া যায় না। “মুম্বয়ী” পাঠান্ত্রে লিখিয়াছিলেন, “অদূরে দামোদর দণ্ডায়মান, উপস্থাস লিখিব কি ? লিখিলেই উপসংহার লিখিয়া ফেলিবে।” এই মিছরীর ছুরিকাঘাতে অর্কাটীন দক্ষী লেখকগণের “কলাপাতা না এড়াতে গ্রন্থ লেখার সাধ” মিটিয়া বাইত।

আমরা প্রতি মাসের প্রথমে বঙ্গদর্শনের প্রতীকায় পথ চাহিয়া বসিয়া থাকিতাম ও পত্রিকা আসিবামাত্র আগে লইবার জন্য ভাড়া ভগিনীর মধ্যে কাড়াকাড়ি টানাটানি পড়িয়া যাইত। অধ্যয়ন আলোচনা এবং আমাদের পক্ষে হিতকর ছিল। আমরা সেই হইতে মাতৃভাষাকে আরো প্রাণের সহিত ভালবাসিতে শিখিয়াছিলাম। সে ভক্তি প্রীতি মৌখিক নহে অন্তরের প্রগাঢ় অহুরাগ। পল্লীগ্রামে যে সকল আত্মীয় বন্ধু “বঙ্গদর্শন” দেখিতে পাইতেন না আমি অদম্য উৎসাহে তাঁহাদিগের জন্য সমগ্র পত্রিকা প্রতিলিপি করিয়া পাঠাইয়া দিতাম, তাহাতে বিন্দুমাত্র ক্লান্তি বা আলস্য বোধ হইত না। সাহিত্যক্ষেত্রের সেই সব মহারথীগণের শিরচ্যুত মন্ডাকিনীর পূতবারিধারে আমাদের তরুণ জীবন সুখাসিক্ত হইয়া গিয়াছিল।

পুত্রগণের পাঠের সুবিধার নিমিত্ত পিতৃদেব কৃষ্ণনগরের প্রান্ত ভাগে একটা বাড়ী ক্রয় করিয়া মাকে সন্তানদিগের সহ সেইখানে রাখিয়া কাণ্ডাস্তরে চলিয়া যান। নিজের সুখ কিংবা আরাম কখন ভাবিতেন না, একাই সুদূর প্রবাসে থাকিয়া ঘেরের নিঃস্বার্থ কর্তব্য পালনে স্থনী বোধ করিতেন। সন্তানগত প্রাণ, তথাপি দূর দেশে একা থাকিয়া একদিনেও অন্যও কঠোর কর্তব্য কার্যে অবহেলা

করেন নাই। বিদেশে কত রোগ, দুর্দৈব ভোগ করিয়াছেন, অথ হইতে পড়িয়া কীৰ্ণকাল শয্যাগত থাকিয়াও ছেলেদিগের পাঠের কতি হইবে ভাবিয়া মাকে সেবা সজ্জবার কারণ নিকটে লইয়া বান নাই। তাহার এই আত্মত্যাগের মহান্ দৃষ্টান্ত কতক অঙ্গসরণ করিলে আমরাও ধন্ত হইব।

আমাদিগের ককনগরের ছোট খাট গৃহখানি ভাবুক চিত্তবিনোদন প্রকৃতির সুক্ণভাবে আলোখ্যবৎ সুন্দর ছিল। চারিদিকের দৃশ্য এমন চিত্ত মুগ্ধকর, শ্রামল লতা-পল্লবে, গগনস্পর্শী দেবদারু বৃক্ষরাজি পরিবেষ্টিত নির্জন শোভায় তাহা কল্পনায় রচিত বলিলে অত্যাঙ্কি হইবে না। চির বসন্ত বিরাজিত তরুভূজে অবিশ্রান্ত পাপিয়ার মধুর সঙ্গীত শুনিয়া শুনিয়া আত্মবিশ্বাস উপস্থিত হইত। পুণিমা রজনীর কোমলী প্রপাতে যখন সমুদয় প্রান্তর, আশ্র কানন, ক্ষুদ্র সৌধ এবং সমুখস্থ গুপ্তোদ্যান একাকার হইয়া বাইত, তখন স্বর্গ মর্ত্য সব যেন এক দ্রবীভূত চন্দ্রকর ভিন্ন কিছুই আর প্রতীয়মান হইত না। জীবনের উত্তমাংশ যৌবন যেখানে অতিবাহিত হয়, সেই স্থানই বিশ্ব সৌন্দর্যের কেন্দ্রীভূত আবাস-ভূমি বলিয়া মনে হইয়া থাকে। তাহাতে আবার সেই গৃহে সর্ব কনিষ্ঠ ভগ্নী "সোদামিনী", ভাই সুহৃদ ও অমির জন্ম হয়। তাই সেই গৃহের সহিত কত সুখের, কত উৎসবের এবং কত আনন্দের স্মৃতি বিজড়িত।

শ্রীমান সুহৃদনাথ চৌধুরীর জন্ম পরেই আমার জ্যেষ্ঠতাত স্বর্গারোহণ করেন। ভ্রাতৃশৃঙ্খকে চক্ষে দেখিয়া বান নাই, জন্ম সমাচার পাইয়াই সেই মৃত্যু শয্যায় শয়ন করিয়াও শিশুর ভাগ্য গণনা করাইয়া দেখিয়াছিলেন যে, কালক্রমে "বালক সোভাগ্যবান, সুপণ্ডিত" ও তাহার আশাহরুপ হইবে। আচার্য্যকে কোণ্ঠীর শুভ ফল দৃষ্টে যথেষ্ট পুরস্কারও দিয়াছিলেন। অমিয়নাথের শুভাগমন তাহার মৃত্যু পরে। অমির জন্ম রাজিকালে, দিব্যপ্রী শিশুর সদ্যঃপ্রসূত রমণীয় কান্তি দেখিয়া তখনি জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম ভ্রাতা মিলিয়া অমিয়নাথ নামকরণ করিয়াছিল। সেই রাজি হইতে অমিয় চির অমিয়, কথায় বলে, "শেষ বার দেশ তার"; অমির সম্বন্ধে এ কথা ষাটিয়াছিল। আদরে, পুঞ্জরত্ন লাভে সর্ব কনিষ্ঠ, মাতৃকোড় বহুকাল অধিকার করিয়া সাত বর্ষেও স্থলে যায় নাই। তাহার পর "বর্ণ-পরিচয়ের" সঙ্গে সঙ্গে বড় উৎপাত আরম্ভ হয়, ভ্রাতাগণের মূল্যবান নূতন পুস্তক দেখিলেই উন্টা অক্ষরে নাম লিখিয়া ফেলিত ও তাহা বলিলে নিঃসঙ্কোচে বলিত, "আমাকে কিছু বলো না, আমি মায়েয় কোলের ছেলে।" তখনও আমাদের গৃহে অনেক আত্মীয় কুটুম্ব বালক থাকিয়া কলেজে অধ্যয়ন করিত, অমিয় তাহাদের সঙ্গে সমানভাবে চলিত। তাহাদিগের বেদিন যেমন লাজে স্থলে বাইতে দেখিত, সে-ও সেদিন সেই লাজে বাইত, তাহাতে কোনদিন জামা-শূণ্য উত্তরীয় মাত্র পরিয়া প্রথর রোজে রিক্ত পদে তাহাদের সঙ্গী হইত। ভৃত্যবাণ্য কিছুতেই মানিত না। বাৎসরিক পরীক্ষায় অমিয় একবার অতিশয় গর্ব সহকারে কলেজ হইতে

আসিয়া বলে সে “সর্বপ্রথম” হইয়াছে। কত নখর পাইয়াছে জিজ্ঞাসা করিলে উৎসাহে বলিয়াছিল, “কেবলই গোলা, কেবলই গোলা।” সে গোলা যে রসগোলা কি কাঁচাগোলা নহে, শূন্য মাত্র বখন বুঝাইয়া দেওয়া হইল, তখন নীরবে কাঁদিয়া অর আনিল। পরদিন প্রাতে অনেক খুঁজিয়াও তাহাকে আর বাড়ীতে পাওয়া গেল না, কাহাকে কিছু না বলিয়া কলেজে বাইয়া আবার নৃতন পরীক্ষা দিয়া সর্বোচ্চ হইয়া সজ্জা দূর করিয়াছিল। আশৈশব সরল স্নেহশীল ও পরদুঃখকাতর খাটি-স্বদেশ অমিয় সহপাঠীগণের অভাব মোচনে এখনও মুক্তহস্ত।

নাট্যকাব্য অর্জুনশুশ্রূষার মুস্তকী মহাশয় সমলে এক বার কৃষ্ণনগর গিয়াছিলেন পিতৃদেবের সহিত বন্ধুত্ব থাকায় তিনি আমাদিগের গৃহে ৬উপেক্ষ হাসের “শরৎ সরোজিনী” নাটক অভিনয় করিয়াছিলেন। দৃষ্টপট ও অন্ত সব সরঞ্জাম রীতিমত না থাকা সত্ত্বেও তাঁহার অপূর্ব প্রতিভায় অভিনয় সর্বদৃষ্টিমান হইয়াছিল। সেই অভিনয় দর্শনে আমরা ত সকলে মুগ্ধ হইবই, আমাদের ছোট বোন “সৌদামিনী” অতি ক্ষুদ্র বালিকা হইয়াও নির্বাকভাবে সমস্ত রাত্রি জাগিয়া তাহা দেখিয়া শুনিয়া পরদিন নিজ নাম “সৌদামিনী” ধারি করিয়া “শরৎ সরোজিনী” নাম লইয়াছিল। সে অতি বুদ্ধিমতী স্মৃতিশীল বালিকা ছিল, তাহাকে কেহ কথায় কিছা কার্যে ঠকাইতে পারিত না। পিতৃদেব একদিন তাহাকে পাঠ বলিয়া দিতেছিলেন, সে অন্তমনস্ক হইয়া সব ভুলিয়া যাইতেছিল, তাহাতে তিনি বড় বিরক্তভাবে বলিয়াছিলেন, “তুমি লেখাপড়া ভালরূপে না শিখিলে বিবাহ-কালীন যোগ্যতর পাত্র পাইবে না।” তাহাতে সে অমনি বলিয়া উঠিয়াছিল, “মা ত ভাল লেখাপড়া জানেন না, তবে কেমন করিয়া আপনার মত স্পৃহা পাইয়াছেন।” তাহার এই উত্তরে তিনিও অত্যন্ত হাসিয়া তাহাকে খেলার ছুটি দিয়াছিলেন ও সেখানে অন্ত ঝাঁহার সব বসিয়াছিলেন, তাঁহার অত্যন্ত কৌতূহলভব করিয়াছিলেন।

পিতৃদেবের সময় হইতেই আমাদিগের গৃহে শিল্প সাহিত্য ও সঙ্গীত চর্চা এমন হইয়া আসিতেছে। তিনি অতিশয় গুণগ্রাহী এবং বন্ধুপ্রিয় ছিলেন। একবার কৃষ্ণনগরের যুবকগণের উৎসাহে সেখানে “বসন্ত মেলা” হয়। ৬নবগোপাল মিত্র মহাশয় তখনকার স্বদেশী দলের ব্যায়ামের নেতা ছিলেন। তিনি বহুতর ছাত্র সমভিব্যাহারে মেলায় উপস্থিত হইয়া ব্যায়াম প্রভৃতি দর্শনান্তর কনসার্টপার্টীর গান বাজ শুনাইয়া কলেজের ছাত্রগণকে মাতাইয়া তুলিয়াছিলেন। বুদ্ধগণ “ছেলে ধরার ভয়ে” ভীত হইয়া উঠেন, যুবকেরা সব চাঁচা তুলিয়া আরো দিন কতক তাঁহাকে সমলে রাখিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়েন। বখন এইরূপ অবস্থা তখন আমাদের গৃহে তিনি সর্বসহ একদিন আসিয়া কনসার্টপার্টীর ঐক্যতানিক বাধনে সকলকে আমোদিত করিতে ব্যগ্র হন। কত প্রিয়বধা শৈশবে অত্যন্ত দুঃস্বপ্ন এবং মাতামহের বধা অবধা আদরে কাহারো কথা মানিত না। কনসার্ট উপলক্ষে

সেদিন সকাল হইতে বন্ধুবান্ধবে বাড়ী পরিপূর্ণ, দুট ছেলে মেয়েরা ঐরূপ দিনে আরো বাড়িয়া উঠে ও শত প্রকার ধোঁরাওয়া করিয়া গৃহের শান্তিভঙ্গ করে। সমস্ত বুঝিয়া প্রিয়বন্ধার উপজবটা সেদিন আরো বাড়িয়া যায় ও কেহ তাহাকে আঁটিয়া উঠিতে না পারিয়া ক্রমাগত পিতৃদেবের নিকট অভিযোগ করিতে থাকে, তিনি তাহাতে কর্ণপাতও করেন না। তাহাকে ঠাণ্ডা করিতে না পারিয়া মা বলেন, “বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দ্বিতীয় ভাগে পড়ো নাই, কদাপি পিতামাতার অবাধ্য হইবে না।” তৎক্ষণাৎ সেও চটপট উত্তর দেয়, “পিতা মাতার অবাধ্য হইতে মানা, বিদ্যাসাগর মহাশয় ত মাতামহ মাতামহীর কথা কিছু বলেন নাই” — ছরস্তু ক্ষুদ্র বালিকার মুখে এই উত্তর শ্রবণে সেই সমাগত বন্ধুবান্ধবগণের মধ্যে উচ্চ-হাস্ত পড়িয়া যায় ও গায়ক বাদকদ্বিকের ভিতর হইতে উঠিয়া মিত্র মহাশয় তাহাকে হুন্দর হুন্দর খেলানা উপহার দিয়া তাহার ভীত বুদ্ধির অশেষ স্থখ্যাতি করিতে থাকেন।

পিতৃদেবের স্বদীর্ঘ কর্ম-জীবনের সম্যক ইতিবৃত্ত স্থখপ্রদ ছিল না। স্বাধীন-চেতা, উদারনৈতিক ব্যক্তির দৃঢ় কর্ম-বন্ধনে বেরূপ কষ্ট ভোগ ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে তাঁহারও অদৃষ্টে সেইরূপ হইয়াছিল। নদীয়া জেলা হইতে আরম্ভ করিয়া বঙ্গ-দেশের নানাস্থান ঘুরিয়া পরিশেষে বেহার জিহত প্রভৃতির শেষ সীমানা বাইতে হইয়াছিল। কোথায় মেহেরপুর, আর কোথায় মতিহারী চম্পারণ কিছুই তাঁহার কপালে বাদ যায় নাই। সাপ্তাহিক বিধিনিষিদ্ধে স্থানান্তরিত আত্মা যখন তখন লিখিত হইয়া বাইত এবং সেই অখণ্ডনীয় বিধান মস্তক পাতিয়া লইতে হইত। সাবডিভিসানে এক একজন হাকিম ছোটখাট লাট বিশেষ, পিতৃদেব এ লাটপদের মর্যাদা বুঝিতে না পারিয়া কয়েদীর দ্বারা গৃহকাঠোর জল বহন করিয়া আনাইতেন না, চৌকিদার দিয়া প্রাঙ্গণ কাঁট দেওয়াইয়া ভূঁইয়ালীর বেতন কাটাইতেন না ও নাজিরকে বাজার সরকার পদে বরণ করিয়া অর্দ্ধমূল্যে হাট বাজার করাইতে স্থগা বোধ করিতেন। কিন্তু তাঁহার চাপরাশী বহু পুরাতন হাকিম-চালক, পরামাণিক পুত্র, ক্ষুদ্র লাটপদ গ্রহণে তাঁহার চকু কর্ণের অগোচরে সেরেসাদারদিগের সহিত সমান ভাবে চলিয়া সর্ব জীবনে ভীতি উপাদান করিত। এক সময় কার্যগতিকে কয়েক মাসের নিমিত্ত আমরাও চুয়াডাঙ্গা সাবডিভিসানে গিয়াছিলাম ও অমিকে অল্প দিনের জন্য সেখানে স্থলে দেওয়া হইয়াছিল এবং তাহাকে চৌকিতে পৃথক বসিতে দেওয়া হইবে কিম্বা সাধারণ বালকগণের সঙ্গে একত্র বেঞ্চে বসিবে জানিবার প্রয়োজন হওয়াতে হেডমাষ্টার মহাশয়ের নিকট হইতে পত্র আইসে। চাপরাশী প্রবর তাহার উত্তর লইয়া স্থলে বাইয়া হেডমাষ্টারের সহিত একাসনে বসিয়া অনেক উপদেশ দিয়া অমির অন্ত সব বালকের সহিত একত্র উপবেশন অল্পচিত হইলেও প্রভুর আদেশ সর্বসহ একত্র বেঞ্চে বসি জানাইয়া আইসে। অমিয় তাহার এই অভদ্র ব্যবহারে অত্যন্ত



লঙ্কিত ও কুশিত হইয়া বাড়ী কিরিয়া সব বলিয়া দেয়। পিতাঠাকুর তাহাতে নরহৃদয়কে অনেক ভৎসনা করিলে সে সহ্য মুখে বলিয়াছিল, “অগ্রবর্তী হাকিমদিগের সময় সাব ডিপুটী বাবুগণের উপর কর্তৃত্ব করিত, পিনাল কোডের ধারা শিক্ষা দিয়া নবাগত সিভিল সার্ভিসের খেতাব যুবক কত তরাইয়া দিয়াছে, বাহ্যজ্ঞানবজ্জিত স্কুল মাষ্টার তাহার নিকট মনুষ্য মধ্যে পরিগণিত নহে।”

এইখানেই এক বুদ্ধ চৌধ্যাপরাধে ধৃত হইয়া পিতৃদেবের নিকট আনীত হইলে বিচারে সাত দিনের কারাদণ্ড হইয়া যায়। অপরাধী পূর্ববন্দী পল্লীবাসী সরল ব্যক্তি। আড়কাঠির হাতে পড়িয়া অর্থ লোভে গৃহত্যাগী হইয়া আইসে, পরে কুলীর সর্দারের চাতুরী বৃত্তিতে পারিয়া পলাইয়া পদ্মজ্ঞে চুয়াডাঙ্গা আসিয়া উপস্থিত হয় ও নিকটে কোন প্রকার সম্বল না থাকায় তিন দিবস একাদিক্রমে উপবাসী থাকিয়া এক কাঁঠাল গাছের তলে বসিয়া ঐ গাছের একটি পতিত পক কাঁঠাল কুড়াইয়া খাইয়া জীবন রক্ষা করে। দুর্ভাগ্যবশতঃ জনৈক কার্যদক্ষ চৌকিদারের চক্ষে তাহা পড়িবামাত্র তৎক্ষণাৎ সে সদরে চালান হইয়া আইসে ও ভারতীয় পিনালকোডের হুম্ব নৈতিক দণ্ডবিধির ধারানুসারে দোষী প্রমাণ হইয়া সপ্তাহ কারাদণ্ড কিংবা জরিমানার আদেশ দিতে পিতৃঠাকুরও বাধ্য হন। তখন সে তাহার আল্পপুঙ্গব অবস্থা সত্যভাবে বিবৃত করিয়া জেলে বাইতে চাহে ও সেখানে যত কষ্টই হউক না কেন, অর্দ্ধাহারেও কতকটা ক্ষুধা শাস্তি হইবে ভাবিয়া জেলেই যাওয়া ইচ্ছনীয় মনে করিয়াছিল। সপ্তাহ পরে কারাযুক্ত হইলে পিতৃদেব তাহাকে পরিতোষ পূর্বক আহার করাইয়া দেশে বাইবার পাথেয়, নূতন ধুতি চাদর ও বিশ্বাসী লোক সঙ্গে দিয়া গাড়ীতে তুলিয়া দিয়াছিলেন। সেই দীনহীন বুদ্ধ গৃহযাত্রাকালীন পিতাকে দুই হস্ত তুলিয়া আশীর্বাদ করিয়া বলিয়াছিল, “দাদা ঠাকুর, তোর বড় ব্যাটা উপর আদালতে বসিবে। ধনে পুজে লক্ষ্মীস্বর হইয়া থাকৃবি ও জীবনে তুই যেন কোন শোক না পাস।”

পিতৃদেবের দ্বারভাঙ্গা গমনের প্রথম বৎসর আমরাও সব সঙ্গে গিয়াছিলাম। দ্বারবন্ধাধিপতি তৎকালে অপ্রাপ্ত বয়স প্রযুক্ত ম্যানেজারের হস্তে রাজস্বের ভার থাকায় সহরটা বড় অপরিচ্ছন্ন এবং ধূলি ধূসরিত ছিল, রাজপথ ও বাজার বিপণিতে রাজত্বীর কোন নিদর্শন পরিলক্ষিত হইত না। সমস্ত সহর খুঁজিয়া বাসোপযোগী একটাও বাড়ী আমরা না পাইয়া পরিশেষে পূর্বতন হাকিমের পরিত্যক্ত গৃহে বাইয়া আশ্রয় লইয়াছিলাম। একে জিহত্তের সজ্জিত ধুলিরাশি তাহার উপর দ্রাক্ষ ঐশ্বর্য আমাদিগকে নিতান্তই উবেজিত করিয়া তুলিয়াছিল। এক পক্ষ কাল অতীত হইতে না হইতে ভয়ানক সংক্রামক রোগের প্রাচুর্য্যে সহরে হাহাকার পড়িয়া গেল এবং অসংখ্য নরনারী মৃত্যুশ্রাসে পড়িয়া প্রাণ হারাইতে লাগিল। দ্বিবারাত্র শববাহকের “রাম নাম সত্য হ্যায়” শুনিতে শুনিতে আমাদিগেরও আহার নিব্রা বন্ধ হইবার উপক্রম হইলে একজন ধনী মহাজনের

কুপায় তাঁহার নগরীর প্রান্ত গৃহে আমরা সকলে উঠিয়া গেলাম এবং সেই নিশীথেই মৃত্যুরূপী করাল কাল আসিয়া অতিশয় স্নেহশ্রী সৌদামিনীকে অকালে অসময়ে অপহরণ করিল এবং সুহৃদও জীবন মৃত্যুর সন্ধিক্ষেপে আসিয়া দাঁড়াইয়া আমাদিগকে একেবারে শোকাভিভূত করিয়া কেলিল। সামান্য দিবস কেহ নিকটে ছিল না এমনি অবস্থা, ভগবানের অসীম দয়া ও মাতার প্রাণপণ সেবায় বালক সুহৃদের জীবন রক্ষা হইবামাত্র আমরা সেখান হইতে চলিয়া আসিলাম, আর কখন দারভাঙ্গা বাই নাই। পরে জনশ্রুতি এইরূপ শুনিয়াছিলাম যে মহারাজার রাজ্যাভিষেকের কয়েক মাস পূর্ব হইতেই রাষ্ট্রকৃত আবর্জনা গো-শকটে চড়িয়া রাজনগরীর সুদূর প্রান্তভাগে চলিয়া গিয়াছিল এবং লক্ষ লক্ষ রক্তত মৃত্যু তাহার হান অধিকার করিয়া ধনাগারের শোভা বর্জন করিয়াছিল। তখনকার ছোটলাট বাহাদুরও সেই সঙ্কিত ধনের কিয়দংশ ব্যয় করাইয়া সহরটা দারবন্ধ্যাধিপের রাজধানী নামের বোগ্যতর করিয়া দিয়াছিলেন।

সরকারী কার্যবশতঃ পিতৃদেব যে সব স্থানে গিয়াছিলেন আমরাও তাহার অধিকাংশই দেখিয়াছি। একবার বড় দিনের অবকাশে আমরা সকলে মিলিয়া মজঃফরপুর বেড়াইতে গিয়াছিলাম। দিব্য পরিপাটি সহরটা, বাঙ্গালীতে পরিপূর্ণ, প্রবাস বলিয়া মনে হইত না, যাওয়া আইসা আদান প্রধান সব দেশের মতন, দৌল দুর্গোৎসব বার মাসে তের পার্বণ রীতি মতন ছিল। সে কালে পশ্চিমে এক একজন অতি খ্যাতনামা বাঙ্গালী ছিলেন, তাঁহাদিগের দয়া দাক্ষিণ্য উদার চরিত্রের কথা অত্যাধি ভুলিতে পারা যায় না। যেমন দারভাঙ্গার কালীবাবু ডাক্তার, দীন দুঃখীর একমাত্র আশ্রয়, তেজ গর্বে যেন জলন্ত বৈদ্যনর। নীচতা তোষামোদ স্বপ্নার সহিত প্রত্যাখ্যান করিয়া আত্মমৰ্য্যাদা রক্ষা ও স্বজাতির কল্যাণ কামনায় জীবন সার্থক করিয়াছিলেন। পাটনার “প্রসন্ন সিংহ”, সিপাইবিদ্রোহের সময় শত শত লোকের জীবন বাঁচাইয়া এবং মৃতব্যক্তির অনাথ স্ত্রীপুত্রের ভরণ পোষণের ভার গ্রহণে অক্ষয়কীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন। তেমনি আবার মজঃফরপুরে কেদার বাবু, দান ও পরোপকারে সকলের শীর্ষস্থানীয় ছিলেন। অবসর দিনে তিনি পাড়ায় পাড়ায় বাইয়া কত নিরন্নকে অন্ন বস্ত্র দিয়া গৃহহীনকে গৃহ প্রদত্ত করিবার অর্থদানে ধনের সার্থকতা সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদিগের গ্রাম দানশীল সদাশয় ব্যক্তি আজ কালের দিনে বড় দুর্লভ।

পূর্বে ঐ সব অঞ্চলে প্লেগ কিংবা ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব না থাকায় অনেক কষ্টিন পীড়াগ্রস্ত ব্যক্তি সেখানে বাইয়া পূর্ণ স্বাস্থ্যলাভে পরিপুষ্ট দেহে দেশে ফিরিয়া আসিতেন, প্রাতঃপ্রমণই ঐ সকল স্থানে স্বাস্থ্য লাভের প্রধান উপায়। আমরাও প্রত্যহ তাহা প্রতিপালন করিতাম। একদিন দৈবাৎ এই নিয়মের ব্যতিক্রম হওয়াতে একটি রহস্যজনক ঘটনা হইয়াছিল। আমার শরীর অসুস্থ

খাকার সকলে বেড়াইতে চলিয়া বান। আমি শালে মস্তকাবৃত্ত করিয়া একা বলিয়া সংবাদপত্র পড়িতেছিলাম, এমন সময় চোগা চাপকান পরিহিত একজন ভ্রমলোক সহস্রমুখে বৈঠকখানায় আসিয়া ছই হস্ত তুলিয়া নমস্কারপূর্বক পাথের চৌকীতে বলিয়া নানা প্রকার গল্প জুড়িয়া দিলেন। শিল্প বাণিজ্য সাহিত্য বিজ্ঞান বিবিধ প্রসঙ্গ তুলিয়া নিজের মতামত প্রকাশ ও আমার মতামত বিজ্ঞাসা করিতেছিলেন। আমি ত অবাক, একে অতি অপরিচিত, নামও জ্ঞাত নহি, তাহাতে বাড়ীতে কেহ নাই, তিনি কোন দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া আমাকে সম্বোধন করিতে করিতে নানা বিষয় স্বাধীনভাবে বলিয়া বাইতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ এইরূপে গত হইলে পিতৃদেব ভ্রাতাগণ সহ সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলে বাবুটি “এই যে দুর্গাদাস বাবু, Good morning, Good morning, আমি ঢেরক্ষণ আপনার বড় ছেলের সহিত বলিয়া গল্পস্বল্প করিতেছি। দিব্য ছেলে মশায়, বেশ বেশ” বলিয়া খুব হাসিতে হাসিতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার এই কোতুকাবহ ব্যবহারে পিতৃঠাকুরও হাসিয়া আমার মাথার শাল অপসারিত করিয়া দিব্যমাত্র মুক্তকেশরাশি বাহির হইয়া পড়িলে তিনি তখন অভ্যস্ত লজ্জাবশতঃ নতমুখে বলিলেন, “মা লক্ষ্মী, ঠিক আগুই মতন দেখিতে। আজ হইতে ইনি আমার মা হইলেন, আমি ছেলে, কাল আমার বাড়ী আপনাদিগের মধ্যাহ্ন ভোজের নিমন্ত্রণ।” তাহার পর সে ভোজের আয়োজন একটা পূর্ব বিশেষ। আমার আপ্যায়ন আশাতীত হইয়াছিল। এই আশ্রয়টী কলুটোলার সেন মহাশয়গণের জামাতা ইঞ্জিনিয়ার ৬মাখব বাবু।

আমরা মজঃফরপুর হইতে ফিরিয়া আসিবার পরেই পিতৃদেব আবার মতিহারী চম্পারণ বড়লী হইয়া বান। তৎকালে তাঁহার নিকট আর কেহ ছিল না, কেবলমাত্র লুসি কুকুর ও হাণ্টার ষোটক সহচরস্বরূপ থাকায় তাহাদিগকে লইয়া কোনরূপে অবসর কাটাইয়া দিতেন। কিন্তু মতিহারী গমনকালে ঘোড়া সঙ্গে লইয়া বাইবার সুবিধা না হওয়ায় পুরাতন বিশ্বাসী সহিস সহ হাণ্টারকে পথ হাঁটাইয়া কৃষ্ণনগর পাঠাইয়া দেন, লুসি হাণ্টারে অতিশয় সন্ধ্যা ছিল, সর্বদা উভয়ে একত্র থাকিত। প্রিয় বন্ধু হাণ্টার সাহেব চলিয়া বাইতেছে দেখিয়া লুসি বিবি কুকুর জ্ঞানদ্বারা চারিদিকের শান্তিভঙ্গ করিয়া তুলিল এবং খানিক পরে আবিষ্কার হইয়া গেল যে লুসি আর গৃহে নাই। অনেক খোঁজ তলালেও তাহাকে কোনখানে না পাইয়া পিতৃদেব তার করিয়া দিলেন। আমরা খালি তাহাদের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। তিন সপ্তাহ অনবরত হাঁটিয়া ছাত্তু দানা ও সহিলের উজ্জিষ্ট চাপাটী প্রসাদে জীবন ধারণ করিয়া লুসি বখন মৃতপ্রায় অবস্থায় আসিয়া পৌছিল তখন তাহার আকৃতি অতীব শোচনীয়। কোথায় বলবান দীর্ঘকায়, যেতাক সৈনিকের রণজয়ী অববৎ তেজস্বী হাণ্টার, আর কোথায় কীর্ণকায়, সারমেয় লুসি। তুজনায় কোন অংশই এক নহে, তথাপি ভালবাসার আতিশয্যে

এই দুই পঞ্চ-জীবন এক হইয়া গিয়াছিল, কেহ কাহাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিত না। সমস্ত দিবস বাড়ীর চতুর্দিকে গ্রহরী রূপে থাকিয়া রাত্রে লুগি হাষ্টারের পদতলে পড়িয়া ঘুমািত। তাহাতে কখন কোন প্রকারে অশ্রু করে আঘাত পায় নাই। উচ্চ নীচে বড়তে অকৃত্রিম স্নেহের কেমন মধুর লম্বিলন হইয়া গিয়াছিল। গৃহপালিত জীব জন্তুর দৈনিক জীবনের ইতিহাস আলোচনা করিয়া দেখিলে এরূপ অনেক ঘটনা দেখিতে ও শুনিতে পাওয়া যায়।

আশু কলিকাতায় যখন প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যয়ন করিতেছেন, সেই সময় পিতৃঠাকুর ভাগলপুর বাইবার পথে একবার তাহাকে দেখিতে আসিয়া তৃত্বপূর্ব্ব ছোট আদালতের জজ ও তাঁহার তৃত্বপূর্ব্ব শিক্ষাশ্রক ৮কুঞ্জলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত পিতাপুত্রে সাক্ষাৎ করিতে বাইয়া গৃহে উৎসবের আয়োজন, নহবৎ, রসনচৌকী, চণ্ডীপাঠ ও নানাপ্রকার আভসবাজীর সমারোহ দেখিয়া শুনিয়া অমনি জন্তভাবে চলিয়া আসিতেছিলেন, এমন সময় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় স্বয়ং আসিয়া হস্ত ধরিয়া ছাড়িয়া দিলেন না এবং তখনকার ছোটলাট সার এসলি ইডনের অভ্যর্থনা সাক্ষ্যসমিতি—পুত্র কন্তার বিবাহ নহে বলিয়া আপ্যায়িত করিলেন। দেখিতে দেখিতে মহাসমারোহে লাট শুভাগমনের সঙ্গে সঙ্গে মহানগরীর ছোট বড় রাজা মহারাজা সব আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিলেন ও সেলামের ধ্বং পড়িয়া গেল। কেবল পিতৃদেব আশু সহ একটা কোণে একক বসিয়াছিলেন, হঠাৎ সেইদিকে লাটের দৃষ্টি পড়িবামাত্র তিনিই অভিবাধন করিয়া নিকটে আহ্বান করিলেন এবং পিতাঠাকুর কখনই দেখাশুনা করেন না কেন জানিতে চাহিলে তিনি বিনীতভাবে বলিয়াছিলেন, “দেখা করিয়া অকারণ জ্বালাতন করা আমার উচিত মনে হয় না, উপকারও কিছু নাই। নিজের কর্তব্য করিয়াই সুখী থাকি।” ইডন লাট আশুকেও দেখিয়া অনেক ভদ্রতা দেখাইয়া জানিতে চাহিলেন, কোন চাকুরী প্রার্থী কি না? পিতা তৎক্ষণাৎ নির্ভীকচিত্তে মুখের উপর বলিয়াছিলেন, “না,—দাসত্ব করিতে দিব না, বি, এ, এম, এ, একসঙ্গে দিয়াছে, বিলাত পাঠাইয়া ব্যারিষ্টার করাইয়া আনিব।” এই অভাবনীয় উত্তরে লাটের লাল মুখ আরো লাল হইয়া উঠিল ও কৃত্রিম হাসি হাসিতে হাসিতে “গুডবাই বাবু” বলিয়া অন্তত্ব চলিয়া গেলেন। ইহাতে কুঞ্জলালবাবুর শুক মুখ ও ভয়বিহ্বল মুক্তি দেখিয়া তাঁহারও অচিরাত্ বিদায় গ্রহণে নিষ্কৃতি লাভ করিলেন। এই বৎসরই ১৮৮১ সালের মার্চ মাসে আশু বিলাত রওনা হইয়া যান। তাহাতে পাবনা রাজসাহী জেলায় একটা মহা হলদুল কাণ্ড উপস্থিত হয়। আশু বিলাত বাওয়ার পর ঐ সময় জাতিবর্গ পিতৃদেব ঠাকুরাণীদিগের জীবনের শান্তি-ভঙ্গ, জাতিনাশ ও সমাজচ্যুতির ভয় প্রদর্শনে তাঁহাদিগকেই একান্ত কাতর ও উদ্বেজিত করিয়া তুলিয়াছিল। দীর্ঘ পাঁচ বর্ষে স্বভাবতঃ এ সব গোল মিটিয়া বাইবার কথা, কিন্তু বক্ষিকা ছিদ্রাহুসন্ধানীর দ্বারা জাত্যভিমানীগণ পশ্চাতে লাগিয়া থাকিলে

এমং আন্তর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আবার নতুন গোলবোপ উঠাইয়া এবার রীতিমত আমাধিগকে “এক ঘরে” করিয়া দিলেন, জাত গেল আমাদের, তাহার জন্ত অশান্তি ভোগ ঘটিল পিসিমাতাধিগের ভাণ্ডে। সাম্প্রতিক হুচতুর ব্যক্তির সময়কালীন আসিয়া পিতাকে গোপনে নিলীধ অঙ্ক-কারে আন্তর সহিত আহার ব্যবহার করিতে এবং প্রকাশে দূরে থাকিয়া জাতি-রক্ষার্থে উপদেশ দিতেও পরাশ্রয় হইলেন না। যদিও এ হিত বাক্য ও শুভ ইচ্ছা ভ্রমে মৃত ঢালার দ্বারা বুঝা হইয়া গিয়াছিল, তবুও তাঁহাধিগের চেষ্টার ফলটি ছিল না। অচল অটল পিতৃদেবের সেই একই কথা, “সমস্ত ছাড়িব, আন্তকে কখন দূরে রাখিয়া জাতরক্ষা করিব না, আন্ত আমার সর্বস্ব, তাহাকে আমিই বিলাত পাঠাইয়াছি, জাত বাইবার ভয় থাকিলে এ কার্য করিতাম না, ক্রমে আমার সব ছেলে বিলাত বাইবে।” তাঁহার এই দৃঢ়তায় ক্রমশঃ জাতি বন্ধু জাত লইয়া পলায়ন করিলেন। আমরা আমরাই রহিয়া গেলাম।

সেকালে বিলাত যাত্রা এমন সহজ ছিল না, বিশেষতঃ আমাদের ঘরের ছেলের পক্ষে সে যে কি কঠিন ব্যাপার ছিল, তাহা আমি বুঝাইতে পারিব না, ভুক্ত-ভোগী ভিন্ন বুঝিতে পারাও শক্ত। আমাধিগের বংশের ও জেলার আন্তই প্রথম বিলাত গমন করেন এবং আমরা কেহ সমাজে উঠিবার জন্ত কখন কোন প্রকার প্রয়াসও পাই নাই। এমনি সামাজিক শাস্ত্রের বিধান যে জাত গেল আমাধিগের, মধ্যে পিসিমাতাগণের প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা হইয়া পাঁচ পাঁচ কাহন কড়িতে মৃতক মুণ্ডন হইতে অব্যাহতি পাইলেন। তাঁহারা ত বাল-বিধবা, আশৈশব ব্রহ্মচর্য্য প্রতিপালন করিয়া চলিডেন, অকারণ কেন তাঁহাধিগের জাতি লইয়া টানাটানি পড়িয়া গেল, সেটা বুঝিবার ক্ষমতা কাহারো ছিল না ও নাই।

নিঃসন্দান বিধবা পিসিমাতারা চির-জীবন আশার আনন্দে নিশ্চিন্ত ছিলেন যে ভ্রাতৃপুত্রগণের, বিশেষতঃ আন্তর হস্তের অগ্নি জলপিণ্ডে পুয়ায় নরক হইতে পরিজ্ঞাপ পাইবেন, তাহা হওয়া দূরে থাকুক, অস্তিম কার্য সম্পন্ন হওয়া স্বকঠিন। জ্যেষ্ঠতাত পুত্র নবকুমার চৌধুরী ঠাকুরদাধা মহাশয়ও তখন লোকান্তরে, হুতরাং উপাস্তান্তর না দেখিয়া নিজেরের শ্রদ্ধা, “কাম্য বুঝোৎসর্গ” ও ব্রাহ্মণ ভোজনের আয়োজন করিয়া দেশের বাবতীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এবং অন্তান্ত সব গণ্যমান্ত ব্যক্তিগণকে নিমন্ত্রণ পত্রদ্বারা আনাইলেন। হরিপুরের “মণ্ডপের আদিনায়” কানাট কেলিয়া তাঁহারা তাহার ভিতর হইতে স্বীয় শ্রদ্ধা কার্য, দান ইত্যাদি সমাপ্ত করিয়া ব্রাহ্মণ ভোজন ও কাছালী বিধায়ে জীবনের শেষ ক্রিয়া সমাধান্তর নিকটস্থ ও সার্থক মানস হইলেন। প্রাচীন মৃত ব্যক্তির অনিবার্য্য অস্তিম কার্য শ্রদ্ধা বাগরেই, আত্মীয় স্বজনের দ্বারা কত আঘাত লাগে এবং ব্যথিত অঙ্গজল রোধ করিতে পারা কত শক্ত হইয়া উঠে, আর জীবিতে নিজের শ্রদ্ধা নিজে করিতেছেন দেখিয়া কেহই রোদন সঘরণ করিতে পারেন নাই। দ্বাধারা এই

শ্রদ্ধা সভায় উপস্থিত ছিলেন, অনিন্দ্যিহি তাঁহাদিগের শোকাবগাতে বক্ষণল সিন্ধু হইয়া গিয়াছিল ও গৃহের পুরাতন দাসদাসীরা পর্যন্ত হাহাকার শব্দে ক্রন্দন করিয়াছিল। জীবিতাবস্থায় শ্রদ্ধা কার্য সমাধা করা অভিশয় কষ্টসাধ্য ব্যাপার, শ্রদ্ধার পূর্বদিন সংবন্ধ, কাঁচা দুগ্ধ মাত্র পান করিয়া থাকিতে হয়, তাহার পর দিবস প্রাতে মৃত্তক মুণ্ডন করিয়া সিন্ধুবৎ শ্রদ্ধা সগিওকরণ ও আর আর আত্মতানিক ক্রিয়া কাণ্ড সম্পাদন পূর্বক অনশনে কুশল্যায় রাজি দিন কাটাইয়া তৃতীয় দিনে হবিশায় গ্রহণ বিধি।

প্রায়োপবেশন, মাতের নীতে জ্বিবেগীতে কল্পবাস, এবং কাম্য বুঝোৎসর্গ ইত্যাদির কঠোরতা পালন করিবার সাধ্য হিন্দু বিধবা নারী ভিন্ন জগতে কাহারো নাই। বাহার্য বৃত্ত পতির সহিত জলন্ত চিতায় পুড়িয়া মরিয়াছেন, বাহার্য শত্রু হস্ত হইতে সত্যি মান রক্ষার্থে “জহর ব্রত” গ্রহণে আত্মজীবন জলন্ত হতাশন গ্রাসে সমর্পণ করিয়াছেন, সে জাতির তুলনা কোথায় মিলিবে আর ?

রাজসাহী জেলায় “কাম্য-শ্রদ্ধা” এ পর্যন্ত আর কেহ করিয়াছে বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায় না। পিতৃদেব বারেন্দ্র পদমর্ধ্যাদা ও সামাজিক উচ্চ অধিকার অনার্য্যে পরিত্যাগ করিয়া পুত্রের হিত কামনায় তাহাকে যে বিলাত পাঠাইয়াছিলেন, তাহাতে কুলপাবন সংপুত্রের দ্বারা বংশগৌরব বাড়িয়াছে এমন নহে। বন্ধজনবীরও সমূহ কল্যাণ সাধন হইয়াছে বলিলে গর্ব করা হইবে না।

বিলাত প্রত্যাপগতদিগকে পরিহার করিয়া জাতিরক্ষা করিতে বাইলে আমাদিগের কোন দিকেই উন্নতির আশা নাই। তাঁহারাই আজকাল জাতীয় জীবনের আশ্রয়স্বরূপ। বিজ্ঞাবুদ্ধি পদমান এবং কার্যদক্ষতায় তাঁহারাই সমাজের শীর্ষস্থানীয়। স্বদেশের দুর্গতি দূর, জাতীয় অভাব মোচনার্থে তাঁহারাই বাহ্য করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাহা স্বরণ পূর্বক বুঝা জাত্যাভিমান বিন্ধিত হইয়া বিলাত কেনরতদিগের সহিত একত্রে সম্মিলিত ভাবে কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলে যে সকল অভাব প্রত্যক্ষ বিদ্যমান, তাহা অচিরে বিদূরিত করিতে পারিবেন ও তাহাদিগকে লইয়া যে সমাজ গঠন করিবেন, তাহাই হারী কল্যাণকর আদর্শ সমাজ মধ্যে পরিগণিত হইবে।

আমর বিলাত বাজার সমুদ্রপথে কবিবর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে প্রথম আলাপ পরিচয়। ঐ একই জাহাজে তিনি ও তাঁহার ভাগিনেয় শ্রীমুতসত্যপ্রসাদ গাঙ্গুলীও বাইতেছিলেন। একে স্বদেশীয় তাহাতে উভয়ই সাহিত্যাহুরাগী, কাজে কাজেই আত্মীয়তাটা শীঘ্র গাঢ়তর হইয়া উঠে এবং সেই বন্ধুত্বের ভাবী ফল স্বখজনক কুটুম্বিতায় পরিণত হয়। ভ্রাতার প্রবাস পথের অধিকাংশ পত্রই রবীন্দ্রনাথের কথায় পূর্ণ হইয়া আসিত। আমরা তখন “তাঁহার নাম মাত্র অনিন্দ্যিহি, চক্ষে দেখি নাই”। নামের পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে কবির “ভয় ভয়” হস্তগত হয়। সে সময় একা আমিই পিতৃদেবের নিকট আরায় ছিলাম। একে

তিনি সরকারী কাজ কর্ণে বিরত, তাহার উপর জ্যেষ্ঠ পুত্রকে স্বদূর বিদেশে পাঠাইয়া নিতান্ত উদ্বিগ্ন ও নিরানন্দ থাকিতেন। তাঁহার মনোরঞ্জনার্থ প্রত্যহ সায়াক্ষে আশ্রয় প্রেরিত “ভগ্ন হৃদয়” পড়িয়া শুনাইতাম, মনোবোগ সহ শুনিতে, মতামত কিছু প্রকাশ করিতেন না, তবে সেদিনের যুবক কবির গুণকের নাম যে “ভগ্ন হৃদয়” সেটা তাঁহার হৃদয় ভাল লাগিত না। সে অতীত “ভগ্ন হৃদয়” রাজ্য হইতে অস্তকার সাহিত্য সম্রাট কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের সিংহাসন অনেক দূর উর্দ্ধে, তবুও সেদিনের এই ক্ষুদ্র “পূর্বকথা” স্মৃতি হইতে লুপ্ত হয় নাই।

আশ্রয় কার্যক্ষেত্র কলিকাতা আগমনের সঙ্গে কবিবরেরও ভ্রাতৃপ্রতিম সত্য বাবুর সর্বদা আসা যাওয়া আলাপ আপ্যায়িতের স্বথের দিনগুলি দিব্য সার্থক বলিয়া মনে হয়। প্রবাস যাত্রাকালীন পথি মধ্যে পিতৃব্য রবীন্দ্রনাথ, ভ্রাতৃপুত্রীয় বোগাতর পাত্র, হস্তের সম্মুখে দেখিতে পাইয়া ভবিষ্যৎ শুভকাৰ্য্যের জন্ত পূর্বেই যে মৌখিক রিটেনার দিয়াছিলেন, তাহারই সফলতায় অল্প এই অকৃত্রিম শ্রীতির বন্ধন আরও দৃঢ় হইয়াছে। জীবনের এক এক যুগে এক একটি ঘটনায় মহুগ্ন হৃদয়ের স্থখস্মিলনে বিশ্বসংসারের সবই যেন আশনার হইয়া যায়। কত অভিনব বন্ধু লাভে আবার নব জীবন সঞ্চার হইয়া থাকে। বিবাহ হুজ্জে যে আত্মীয়তা জন্মে, তাহা চির স্থখকর স্নেহের অপূর্ব সঞ্চ।

ঠাকুর পরিবারে ভ্রাতার বিবাহকালে দেশে আর নূতন কোন আন্দোলন উপস্থিত হয় নাই, বরং বুদ্ধিমতী সহৃদয়া পিসিমাতারা এ কার্য্য অন্তরের সহিত অহুমোদনই করিয়াছিলেন ও শ্রীলা স্নানক্ষণা ভ্রাতৃপুত্রবৎ দেখিয়া পরম পরিতুষ্ট হইয়াছিলেন। পরমন্ত বধুর আগমনে আমাদিগের গৃহের সর্বাংশে মঙ্গল হইয়াছে। পিতৃকুল “কন্তাগত”, কিন্তু পিতৃদেব কনিষ্ঠা কন্তা ও দৌহিত্রীকে স্বশ্রেণী এবং বারেন্দ্র সমাজে বিবাহ দিলে কতকটা পূর্ব সঞ্চ রহিয়া বাইত, তিনি তাহা না করিয়া যখন আবার তাহাদিগকে রাঢ়ী শ্রেণীতে বিবাহ দিলেন, তখন দেশের সহিত সমাজিক সঞ্চট্টা একেবারেই বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। পরিবর্তনশীল কালের গতির সঙ্গে ক্রমে পুরাতনের তিরোধান ও নূতনের আবির্ভাব হইতে দেখা যায়। কালক্রমে সকল বিষয়েই একটা পরিবর্তন হইয়া থাকে, তাহা কাহারো চেষ্টা সাপেক্ষ নহে। ক্রমশঃ সেই পূর্বকার কঠোর জাত্যভিমানের নিয়ম সব অমনি অমনি শিথিল হইয়া আসিতেছে, সেইজন্য আশা করা যায় যে, সামাজিক ক্রিয়া-কলাপে বিলাত প্রত্যাগতদিগেরও আসন সমান ভাবে রক্ষিত হইবে। তাহাদিগকে ত্যাগ করিয়া হিন্দু সমাজ আর কখন উন্নতির চরমোৎকর্ষ লাভ করিতে পরিবেন না। সমাজের অশেষ দুর্গতি বাহাতে তিরোহিত হয়, এক্ষণে তাহাই করা কর্তব্য। কাশ ফুলীন রাঢ়ী বারেন্দ্র ব্যবধান দূর করিয়া সকলে একজ্ঞে মিলিয়া স্বদেশের হিতকল্পে আত্মসমর্পণ করিয়া দিলেই জাতীয় মঙ্গল। “ভাই ভাই ঠাই ঠাই” থাকিলে চলিবে না, সকলে এক হইয়া ষাটপূজা করিতে হইবে।

“জননী জন্মভূমিষ্ঠ স্বর্গাদপি গরীয়সী।”—এই মহানব্র জীবনে কখন যেন  
বিস্মৃত না হই।

দীর্ঘকালব্যাপী অবিশ্রান্ত পরিশ্রম ও অঙ্গ বঙ্গ কলিক পরিশ্রমণে যুবকের  
পূর্ণতর স্বাস্থ্যও ভগ্ন হইয়া যায়, তাহার উপর শিশুদেবের ত বয়সও হইয়াছিল  
এবং একেবারে অনবকাশে নীরোগ শরীর হঠাৎ ভাঙিয়া গেল ও রাজকার্য্য  
হইতে অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। তখনও কার্য্য জীবনের মেয়াদ ফুরায়  
নাই, কিন্তু ইহলোকের দিন অকালে ফুরাইয়া আসিয়াছিল। তাঁহার স্বর্গারোহণে  
আমরা সে স্নেহ, মায়্যা, মমতা ও নিরাপদ আশ্রয় চিরদিনের জন্য হারাইলাম,  
আর কোথায় পাইব ? তিনি একাধারে জনক জননী ও ক্রমাশীল স্বার্থ বন্ধু  
ছিলেন। দয়াময় ঈশ্বরের নিকট যেমন অহুতাপে সর্ব পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইয়া  
থাকে, তেমনি সে পাখিব দেবতার কাছে আমাদের এক বিধু সরল অশ্রু-  
জলে “সাত খুন মাপ” হইয়া যাইত। তাহার অভাব এ জীবনে কিছুতেই মোচন  
হইবার নহে। বাহা গিয়াছে, তাহা এ সংসারে কখনও পাইব না। তাঁহার  
জীবনব্যাপী স্নেহরূপ পরিশোধ করিবার ক্ষমতা আমাদের কাহারো নাই।  
তাঁহার আদর্শ চরিত্রের ও স্বাধীন উদার ভাবের কণামাত্র অনুসরণ করিয়া চলিতে  
পারিলেও এ জীবনের কতক সার্থকতা হইতে পারে।

“কল্পনা গিয়াছে থামি  
কবিতার প্রসবণ বহে না অন্তরে,  
গীতধ্বনি স্থখ আশা,  
বিশ্বব্যাপী ভালবাসা,  
কিছু আর দেখি না সংসারে,

মমতা আলস্য শূন্য,  
কিছু নাই, স্মৃতি আছে হৃদয় মাঝার,  
ব্যবধান প্রাণে প্রাণে,  
স্নেহের বন্ধন হীনে,  
দূরতায় শোভে না সংসার।

মহান সত্যের জ্যোতি,  
করুণায় অবীক্ষিত হিয়া, দয়াময়  
কৃপাসিদ্ধ যুক্তিমান,  
স্নেহ বিগলিত প্রাণ,  
শ্রীতিভাবে মগ্ন সমুদয়।



তব অন্তর্ধানে দেব  
জগতের সব বেন সমাপ্ত এখন,  
অশ্রুসিক্ত মর্ম্মতলে,  
শুধু ক্রন্দন উথলে,  
স্বতি কহে তোমারি বচন ।

তব পদচিহ্ন শিরে  
তোমারি আদর্শ দেব মানস নয়নে,  
তোমারি স্নেহের ভাতি,  
দেখাইছে দ্বিবা রাত্তি,  
কর্ত্তব্যের পথ এ অন্ধিনে ।

ব্রহ্মাণ্ডের সার পিতা,  
জননী রূপিনী মায়ী, বিপত্তি সহারে,  
লভিয়া অমরধাম,  
চিরন্তরে ভাগ্যবান,  
তুমি দেব শান্তির নিলয়ে ।

“সমাপ্তি” স্থখের দিন,  
আনন্দের ঐক্যতান প্রাণের ছ্যারে,  
বাজে না মধুর রবে,  
আর দেখিব না ভবে,  
জীবনের স্নেহ মূল্যধারে ।”

নীহারিকা, দ্বিতীয় ভাগ ।

মহুস্ত জীবনের কথা অফুরন্ত, তাহাতে আবার “পূর্বকথা”, তাহা যদি শুনিবার  
বৈধ্যশীল শ্রোতা পাওয়া যায়, তবে ত “সোণায় সোহাগা” হইয়া থাকে,  
বিশেষতঃ এই বয়সে কথা আরম্ভ করিলে খাশা শক্ত, আমার স্বর্গীয় পিতৃপুরুষ  
ও মাতৃগণের আশীর্ব্বাদে ইহা যে কতক নিষ্কিয়ে লিপিবদ্ধ করিতে পারিলাম,  
এই পরম সৌভাগ্য মনে করি এবং মাতৃদেবী ইহাতে যে স্বখাহুভব করিবেন,  
তাহাই আমার সার্থকতা ।

## জন্মদিনে পূর্বকথা সমাপ্ত

(১৪ই আশ্বিন)

“বধূগণ” শুন শুন, তোমাদের কহি পুনঃ  
অতীতের ছ’চারিটা কথা,  
আজি নাকি জন্মতিথি, উপহারে চির ইতি,  
দাবিহীন জীবন সর্বথা ।  
ষষ্ঠী কল্পে মহামায়া, ভক্তগণে পদ ছায়া  
আসে দিতে সেবকের তরে,  
আশ্বিনে তাহারি সাথে, তাঁরি পদরক্ত মাখে,  
আসিয়াছি জনকের ঘরে ।  
বোধনের আয়োজন, ঘরে ঘরে আবাহন,  
বিষ্ময়ে ঘটে অধিষ্ঠান,  
ঢাক ঢোল বাজে কাড়া, দিকে দিকে পড়ে সাড়া,  
বর্ষ পরে জাগাইয়া প্রাণ ।  
শম্ভু, ঘণ্টা, বাজে বাঁশী, বাজ কর লুখে হাসি,  
ধূপ ধূনা সমীরে ছড়ায়,  
ধনী দীন সর্বজনে, পরিভৃগু ফুল মনে,  
নব বস্ত্র অঙ্গে শোভা পায় ।  
আনন্দের কলরব, শরতের মহোৎসব,  
আনন্দে আনন্দময়ী আসে,  
দেবী পূজা মহা হর্ব, সেই বেন নব বর্ষ,  
চারি ধারে হাসির উল্লাসে ।  
এই দিনে জন্ম মোর, ঠিকুজী কোণ্ডীর জোর  
বড় ছিল ভাগ্যের লিখনে,  
দৈবজ্ঞ কহেন যায়, “সর্ব লক্ষণা” তার  
কস্তার আকৃতি দরশনে,  
“বৈধব্য ললাটে নাই, ধনে গুড়ে পূর্ণ ঠাই,  
যেথা যাবে তোমার দুহিতা,”  
জননী ভাবেন মনে, পাইলেন “শুভক্ষণে  
হেন কস্তা তুলনা রহিতা ।”  
“বারতুয়ে” মাতামহ ষষ্ঠী পূজা সমারোহ  
তার ঘরে, বর্ণনা অতীত,  
অকাতরে অন্নদান, লোণা-দানা ধাত্রী পান,  
কুটুম্বিনী গৃহে উপনীত ।





## পূর্ব কথা পরিশিষ্ট

আবার।

মহুয়া জীবনের অতীত কাহিনী পূর্ব কথা অক্ষুণ্ণ, তাহার উপর যদি আবার অরণশক্তিটা একটু বেশী রকমের হয় ও গত স্মৃতি স্বথময় থাকে, তাহা হইলে তো সোণায় সোহাগা। পূর্ব কথা পরিসমাণ্ড করিয়া পুনর্ব্বার তাহা বলিতে বলিয়াছি কেন, জিজ্ঞাসা করিলে বলিব, বয়সদোষ। এ বয়সে এক কথা তুলিলে আর ছাড়া যায় না, ঘুরিয়া ফিরিয়া তাহাই আসিয়া পড়ে। গত দিনের সহিত বর্তমানের সম্পর্ক বড় কম, বাহা গিয়াছে, তাহা ভালই হউক, কি মন্দই হউক, আজ সে জন্ত ত ভুগিতে হইতেছে না, কাজেই স্বথেরই বলিতে হয়। আমাদের বাল্যকালের সহিত আজ কালিকার মেলিনস্ ফুড এবং হরলিক্ সেবিত বাল্যকালের অনেক প্রভেদ। আমরা যখন ছোট ছিলাম, অর্থাৎ ষতদিনের কথা মনে আছে, তাহার সহিত তুলনায় সমালোচনা করিলে দেখিতে পাই, যে অতীতের সঙ্গে বর্তমানের কোন দিকেই মিল নাই। রোগ পীড়াও সব ভিন্ন ভিন্ন। টনসিল্ বলিয়া রোগটা আমরা কখন সেকালে দেখি নাই, আর এখন ঘরে ঘরে বালক বালিকা ও বয়স্ক নরনারীরাও ঐ রোগাক্রান্ত হইয়া কত কষ্ট ভোগ করে। আমরা একানবর্তী পরিবারের জ্যেষ্ঠতাত খুল্লতাতদিগের পুত্রকন্যাদের সহিত একত্র প্রতাপালিত হইয়াছি। পিসিমা জ্যেষ্টিমারাই গৃহের সর্বময়ী কর্তা ছিলেন, তাঁহাদের বুদ্ধি বিবেচনার উপর সমগ্র পরিবারের সুখ, দুঃখ, সেবা শুশ্রূষা নির্ভর। আমার জননী এবং খুড়িমাতারা তাঁহাদের দ্বারা পরিচালিত হইয়া পারিবারিক সকল কার্য্যেই যোগ দিতেন, তবে পশ্চাৎ হইতে গুরুজনের আজ্ঞা পালন করাই তাঁহাদের প্রধান কার্য্য ছিল। আমরা সকলে মিলিয়া দশবারটা বালক বালিকা গৃহে ছিলাম। তাহার মধ্যে পিসিমাতার নাতি নাতিনীও ছিল। একই নিয়মে সবাইকে এক পথে চলিতে হইত। গৃহের সকল বালক বালিকাই যে শাস্ত্র স্থির ছিল, এমন নহে। “ছুষ্টের দমন আর মহতের হিত, এই তার কুলধর্ম্ম জগতে বিদিত।” এইটা গৃহিণীরা মনে রাখিয়া সমানভাবে কর্তব্য পালন করিতেন। আমার স্বর্ণদিদি (জ্যেষ্ঠতাত কন্যা) যেমন ভাল ছিলেন, তাঁহার ছোট দাদা কালীপ্রসন্ন চৌধুরী আবার তেমনি দুর্দান্ত ও দুরন্ত বালক থাকায় তাঁহাকে নরম গরমে ঢালাইতে হইত। “অহুয়োগে তিনি কেনা” ছিলেন, শাসনের কেনা নহেন।

আমরা রাজি প্রভাতে শয্যা ত্যাগ করিয়াই রাজিবাস ছোট ধূতি শাড়ী (বচকা) ছাড়িয়া পরিস্কৃত খোত বস্ত্র পরিয়া ঠাকুর পূজার ফুলদুর্বা আনিবার জন্ত লাজি হাতে বাগানে বাগানে ভ্রমণ করিয়া তাহা আনিতাম।

নিজের কি অন্তের বাগান ভিন্ন ছিল না, সকল সমান, দেবপুজার ফুল সর্বত্র তুলিবার অধিকার ছিল, বিশেষতঃ কুমারী কল্যাণ সকলের নিকট ভগবতীর অংশ বলিয়া পরিগণিত হইতেন। এই পুষ্প আহরণের সময় বোনে বোনে সখীতে সখীতে ভাব অভাব বগড়া যে হইত না, এমন নহে, তবে বাড়ী আসিয়াই সে সব মিটিয়া বাইত, ও প্রত্যেকের সাজি জ্যোটিমাকে বুঝাইয়া দিতে হইত। তিনি পুজার আয়োজন করিতেন এবং অতিশয় নিষ্ঠাবতী ছিলেন। পুষ্পচয়নে আমি তেমন দক্ষ ছিলাম না। আমাদের বড় তরফের স্বর্ণদিদি ও ছোট তরফের কুমুদিনী দিদি (মধ্যম জ্যাঠামহাশয়ের কল্যাণ) সর্বকাজেই বিশেষরূপে পারদর্শিনী ছিলেন। জ্যোটিমা আমার, পুষ্প পাছে শাদা লাল নীল বিবিধ বর্ণ ফুল যখন সাজাইয়া রাখিতেন, তাহা দেখিয়া নয়ন যেন জুড়াইয়া বাইত। “এমন পবিত্র, এমন কোমল দেব-পদ ভিন্ন কোথা যাবে বল?” বেলা প্রহরাভীত হইলে তিনিই আমাদের আহাঙ্গাদির ব্যবস্থা করিতেন, আমরা প্রাতঃকালে গরম গরম দৈশী আতপ চাউলের ক্যান্সা ভাত যতরূপ সিদ্ধ পোড়া গৃহজাত গব্য ঘৃতসহ খাইয়া পাড়ায় কাহারো না কাহারো বাড়ী খেলিতে বাইতাম। সে খেলাও এ যুগের সঙ্গে একেবারে ভিন্ন। ত্রীকঙ্কর গোষ্ঠ রামরাবণের যুদ্ধ তীর্থযাত্রা গঙ্গাস্নান এবং সাংসারিক দশকর্মের অভিনয়। আড়াই প্রহর বেলা পর্য্যন্ত আমাদের কোন খোঁজ ভ্রমাস থাকিত না; তখন গৃহিণীরা ও বধূগণ দৈনিক গৃহকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতেন। আমাদের গ্রামে ভাঁড়ার বাহিরে ভাণ্ডারীর হাতে গোলায় থাকার নিয়ম। সেই সকালে আসিয়া লোক গণিয়া সকল দ্রব্য সামগ্রী সরবরাহ করিত। তরকারী, পিসিমাতারা কুটিয়া দিতেন, দাসীগণ রন্ধনশালার কার্য্য করিত। সেকালে বেতনভোগী পাচক ব্রাহ্মণের হস্তে কর্তারা আহাঙ্গ করিতেন না। যত বড়ই ধনী জমিদার গৃহিণী হউক না কেন, তাঁহাকে স্বামী পুত্র আত্মীয় স্বজনের জন্ত দুই বেলা রন্ধন করিতে হইত। বিবাহিতা কল্যাণ পিতৃভালয়ে থাকাকালীন পিতা পিতামহদিগকে পরিবেশন করিত। তখন কুটুম্ব ছাড়া গৃহই ছিল না। প্রত্যহ দেবসেবা, বার মাসে তের পার্বণ, ব্রত, নিয়ম, ব্রাহ্মণ ভোজন লাগিয়াই থাকিত। ঠাকুর ভোগ বিধবারা রাখিতেন।

সেখানে বৈবাহিক, জামাতা ও স্ত্রীলোক প্রভৃতির সম্মুখে বধূগণের বাহির হইবার নিয়ম ছিল না; এখনও সে অঞ্চলে এ প্রথা অস্তিত্ব হয় নাই। পরিহাসের সম্পর্ক হইলেও বধূগণ প্রত্যক্ষভাবে কথাবার্তা কহিতেন না। ছোট ছোট দেবর নন্দ অল্প বালক বালিকা কিংবা বৃদ্ধা দাসীর দ্বারা ঠাট্টা তামাসার উপকরণ প্রেরণ করিতেন। দুই বার যখন কর্তাদিগের সঙ্গে অন্তঃপুরে তাঁহারা আহাঙ্গ করিতে আসিতেন, তখন স্নাকদার ফুলুড়ী ও চাউলগুড়ির দুধ পাঠাইয়া দিতেন ও জামাতারা ঠকিয়া গেলে খুব একটা হাসি পড়িয়া বাইত। “অজ্ঞাত ফুলশীলো”রা পুরমধ্যে বাইতে পারিতেন না, সেটা বংশপরম্পরায় আজও দেখে

চলিয়া আনিতেছে। অস্ত্রকার জগন্নাথ ক্ষেত্র, সেকালে কুজাপি দেখা বাইত না। মহাপ্রসাদের ছড়াছড়িও এমন ছিল না। নিত্য নৈমিত্তিক গৃহ কার্য সম্পন্ন হইলেই গৃহিণীরা আমাদের গায়ে ডাকিয়া আনিতেন। পিসিমাতা কি জ্যোঠাই আমাদের গায়ে প্রচুর সরিষার তৈল মাখাইয়া ও গৃহভাত নারিকেল তৈলে কেশ রঞ্জিত করিয়া এক একখানি গামছা ও ছোট ছোট কলসী কিংবা বড় তামার বটা হস্তে দিয়া দীর্ঘি কি পুরুরিণীতে স্নানার্থে লইয়া বাইতেন। গায়ে মার্জনা তাঁহারাই করিয়া দিতেন, এক একজনের অবগাহন স্নান সমাপ্ত হইলে শুষ্ক বস্ত্র পরাইয়া সিন্ধু শাড়ী শিরোপরি আচ্ছাদন স্বরূপ দিয়া জলপূর্ণ কলসী কক্ষে তুলিয়া দিতেন ও সন্ধ্যা করিয়া বাড়ী আনিতেন। ইহার কোনরূপ ব্যতিক্রম কখনও হইতে পারিত না। এ মিলিটারী অর্ডারের স্তায় নীরবে মানিয়া চলিতে হইত, নতুবা কোর্ট মার্শেলের ভয় ছিল।

স্নানান্তে আমরা মেয়েরা জলযোগের আয়োজন করিতে চণ্ডীমণ্ডপে বাইতাম, কেহ ফল কাটিতাম, কেহ রেকাবী সাজাইতাম, কেহ বা ভৃত্যগণকে চিড়াগুড় ভাগ করিয়া দিতাম। বালকেরা ফল খাইয়া কাছারীতে হাতের লেখা শিখিতে বাইত। মদন মৈত্র নামে আমাদের এক পুরাতন আমলার হস্তাক্ষর ছাপার অক্ষরের স্তায় ছিল, এজন্ত তিনি ঐ কার্য করিতেন। আমরা বৃদ্ধা দাস দাসী আয়লাবর্গকে, দাদা, দিদি, কাকা, জ্যোঠা বলিয়া ডাকিতাম, নাম ধরিতাম না, ছোটদের মালের বেটা, কিংবা দাসের বেটা বলিতাম। তাহারা আমাদের আত্মীয়বৎ ছিল। একালের আধাবয়সী চাকর “ছোকরা” “Boy” নামে অভিহিত। গাই গোত্র পিতামাতার নাম লুপ্ত। শুনিয়াছি, “মৈত্রদাদা” বড় স্মরণিক ও জামাই, বেয়াই, শ্রালক বাবুদিগকে ক্ষেপাইতে খুব দক্ষ ছিলেন। কোন বৈবাহিক যদি অহিফেন সেবী হইতেন, তাঁহার পুত্র জামাতা বাবাজীকে কোতুকচ্ছলে তাড়াতাড়ি মিছরির সরবৎ দিতে ভাগ্যুরীকে ভৎসনা করিয়া বলিতেন, “এত বেলা হইয়াছে এখনও সাম্রাণ কি লাহিড়ী মহাশয়কে সরবৎ দিসনি ? আফিমে নাড়ীর ছেলে, যদি মাথা ঘুরিয়া পড়িয়াই যায়, তখন ব্রহ্মহত্যা হইবে যে।” এক কুলীন জামাইবাবুর গালে কি একটা বড় কাল দাগ ছিল, তাহাতে মদন দাদা গম্ভীরভাবে ছোট কর্তাকে বলিয়াছিলেন, “এ বড় ভাগ্যিবন্ত ছেলে, গালে লক্ষ্মীর পারা আছে।” একেবারে দোলযাত্রার সময় যাত্রার গানে ঘর জামাই সং দেওয়াইয়া ফুরক্ষেত্র বাধাইয়াছিলেন।

বালকগণ আগে মাটীতে, পরে তালপত্রে এবং পরিশেষে বালির কাগজে লেখা শিখিত। শত দুর্গা, কালী নাম লিখিয়া হস্ত পাকাইয়া শেষে অস্ত্র কথা লিখিতে হইত। চিঠি পত্র বাহাই লেখনা কেন, পূর্বে দেব দেবীর নাম লিখিয়া কার্য আরম্ভ করিবার নিয়ম ছিল। শাস্ত্র বৈষ্ণবের মধ্যে আবার ভিন্ন ভিন্ন প্রথা থাকায় শাস্ত্রের ছেলে দুর্গা কালী শিব গণেশকে এবং বৈষ্ণবের ছেলে ত্রীহরি

শ্রীকৃষ্ণ নাম স্মরণ করিয়া কাগজের শিরোধেশে নিজ নিজ গৃহদেবতার নাম লিখিত।

### বিবিধ

মধ্যাহ্নে আমাদের আহার পরিবেশন শিখিতে হইত, ছোট ছোট থালায় অল্প ব্যঞ্জন লইয়া ভূত্যাগণকে পরিবেশন করিয়া দিতাম। কাজটা প্রমসাদ্য ও একটু বিবেচনা সাপেক্ষ। সকল দ্রব্য সমান ভাগে পাড়ে পাড়ে দিলে তবে সকলেই তুল্যরূপে পায়, নতুবা কাহাকেও বেশী এবং কাহাকেও কম দিয়া কেলিলে অনর্থ বাখিয়া যায়। গৃহকার্য্য রীতিমত তখন বাহা শিখিয়াছিলাম চির প্রবাসে থাকিয়া তাহার আর কোনও সার্থকতা হয় নাই, বরং অনভ্যাসে এখন সমুদয় একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছি।

সায়াহ্নে আমাদের ছোট তরকের পিতৃঘসা কৃষ্ণমুন্দরী দেবীর গৃহে রামায়ণ মহাভারত পাঠ হইত। আমরা তাহা শুনিতে নিত্য যাইতাম, সেইখানেই কেশবদ্বন্দ্বন চলিত, জেঠিমা পিসিমারা সেইখানেই উপস্থিত থাকিতেন ও আমাদের শিরে আবার তেল দিয়া কেশ রচনা করিয়া দিতেন, ইংরাজী “বাণ-খোপার” নাম আমাদের খোপা বাঁধিবার নিয়ম ও কপালের উপর সকলেরই “ধর” কাটা ছিল।

গ্রামে কানীশ্বরী নামী এক বাল বিধবা ছিলেন, তাঁহার ইহসংসারে আপনার বলিতে কেহ না থাকায় গ্রামের সকলে তাঁহাকে বড় স্নেহ করিতেন; আপন বিপদে রোগ শোকে সর্ব্বাঙ্গে তাঁহাকে লোকে ডাকিতেন। রোগীর শয্যার পাশে অতিথি অভ্যাগতের জন্ত রন্ধনশালায়, পূর্বে তাঁহাকেই দেখিতে পাওয়া যাইত। তিনি শৈশবে পিতৃ মাতৃহীনা বালবিধবা হইয়াও শোকাহুলা বিধবার অশ্রুজল মুছাইয়া তাহাদিগকে সান্ত্বনা দিতেন, পুত্রবিয়োগবিধুরা মাতার প্রাণে শাস্তি দিতে আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া সেখানে পড়িয়া থাকিতেন। কানীশ্বরী ময়ূরদ্বাতা ইষ্ট গুরুদেবের নিকট দিব্য লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন।

“গঙ্গা ভক্তি তরঙ্গিনী” “রামায়ণ” “মহাভারত” “বৈষ্ণব পদ্মাবলী” “চৈতন্য-চরিতামৃত” প্রভৃতি গ্রন্থ তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল, ঐ সকল যখন স্মরণ করিয়া ভক্তিভরে ছলিয়া ছলিয়া অধ্যয়ন করিতেন, আমরা একেবারে মুগ্ধ হইয়া অনন্ত মনে বলিয়া তাহা শুনিতাম। কখনও বা চকুর জলে বজ্রাঙ্কল ভিজিয়া যাইত। সেই গত কালের দৈনিক পাঠ শ্রবণের উপকারিতা এই পর জীবনে অহুভব করিয়া এখন বুঝিতে পারি যে তাহাতে কি মহৎ শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছি, তিনি পাঠক, আর আমরা গ্রামভুক্ত আবাল বৃদ্ধ বনিতা শ্রোতা। সেই যথুর কণ্ঠ, সেই ভক্তিগদগদ ভাব এখনও ভুলিতে পারি নাই; তাঁহার মুখে যে সমুদয় রামায়ণ মহাভারতের



অবৃত্ত কাহিনী অনিরাছলাম, তাহাতেই প্রকৃত শিক্ষা হইয়াছিল, তাহার পর নিজে পড়িয়া নূতন কিছু শিখি নাই, পূর্বের পাঠ পুনরাবৃত্তি করিয়াছি মাত্র ।

আমাদের গ্রামের অধিকাংশ রমণী তৎকালেও লেখাপড়া জানিতেন না। ছাপার পুস্তক পাঠ ও নাম স্বাক্ষর করিতে না পারিতেন, এমন নারী সেকালে অল্পই ছিলেন ; তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ রীতিমত লেখাপড়া জানিতেন, কেহবা কাজ চালাইতে পারিতেন, এই বাহা প্রভেদ । আমার মধ্যম পিতৃঘনা ৬ভগবতী দেবী ছোট ভরকের ৬কৃষ্ণস্বন্দরী দেবী ও নপিসিমাতা যুগ্মদেবী বেশ লিখিতে পড়িতে পারিতেন, তবে কানীশ্বরী সর্বাঙ্গের পণ্ডিতা, ছোট ছোট বালক বালিকাগণ তাঁহার নিকট লেখাপড়া শিখিতে বাইত । অসহায় বালবিধবার রূপ বড় বিপদজনক, আত্মসম্মান রক্ষার্থে তাঁহাকে অনেক ক্লেশ স্বীকার করিতে হয় । আমাদের কানীশ্বরী যৌবনে অতিপয় স্বরূপা ছিলেন, সুদীর্ঘ কৃষ্ণিত কেশ, অস্বস্ত লোচন ও স্তম্ভায়, দীর্ঘ, পূর্ণ দেহ যষ্টি, দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত, এতদ্ব্যতীত তাঁহার একাকিনী পথ ঘাটে চলা ফেরা নিরাপদ না থাকায় তিনি কাহাকেও কিছু না বলিয়া এক নিশীথ রাত্রে পুরাতন বুদ্ধা পরিচারিকা সহ জেলা কোর্টের জজ সাহেবের নিকট আশ্রয় ভিক্ষার আবেদন পত্রসহ বাইরাউপস্থিত হন, তৎকালে তিন মাস পরে দায়রার বিচারার্থ জজ মহোদয় পাবনা আসিতেন, ইহার মধ্যে অল্প সকল কাজ কর্ষ রাজসাহীতেই হইত, ব্রহ্মবাদিনী অরুণভারী স্ত্রী তেজস্বিনী ব্রাহ্মণ কন্যাকে একাকী বিচারালয়ে দেখিয়া ও তাঁহার বিপদাবস্থার কাহিনী শ্রবণে দয়ালু জজ সাহেব এক “জরুরি পরোয়ানা” গ্রামে পাঠাইয়া আত্মা প্রদান করিলেন যে “এই বিধবা ব্রাহ্মণ কন্যার প্রতি কখন যদি কোনও রূপ অত্যাচার অনিতে পান, তাহা হইলে বিনা বিচারে দোষীদ্বিগকে ছয় মাসের জেল ক্রীষরে পাঠাইবেন ।” জজ সাহেব সরকার হইতে দুঃখিনী বিধবাকে মাসিক পাঁচ টাকা বৃত্তি ধার্য্য করিয়া দিলেন । ইতিমধ্যে কানীশ্বরী তীর্থ ভ্রমণ করিয়া “হঠি তর্কালঙ্কার” সাজিয়া মৃণ্ডিত মস্তকে সগৌরবে গ্রামে ফিরিয়া আসিয়া এক পাঠশালা খুলিয়া বসিলেন, সেখানে পল্লী বালকবালিকারা অনেকেই অধ্যয়ন করিত, সে সময় তিনি আর কোন বাড়ীতে পড়িয়া শুনাইতে বাইতেন না, তাঁহার গৃহে প্রত্যহ পাঠসভা বসিত, আমরা নিয়মমত তথায় যাতায়াত করিতাম, তাঁহার পাঠশালায় পড়িতাম না । বুদ্ধকালে কানীশ্বরী ঠাকুরাণী এক ব্রাহ্মণ সন্তানকে উপনয়ন দিয়া ভিক্ষাপুত্র রূপে গ্রহণ করিয়া তাহাকে নিজের বথার্কষ দান করিয়াছিলেন । বালবিধবা হইয়াও তাঁহার হৃদয় পবিত্র মাতৃস্নেহে পরিপূর্ণ ছিল ।

আমার মাতামহালয়ে হাতে খড়ি ও চূড়াকরণ হইয়াছিল । মাতার এক অতি বৃদ্ধ ও টুকটুকে পক্ষ আত্মবৎ বেলমাখা ঠাকুরদাদার নিকট লেখা শিখিতাম । তিনি বধির ছিলেন ও তাঁহার এক অতীব প্রিয়তম স্বদর্শন দ্বিব্যাক্তি দৌহিত্র ‘কৃষ্ণক’ উচ্চৈঃস্বরে বলিতেন, “একটা ক লেখত, একটা খ লেখত”, তাহাতেই

আমাদের সুবিধা হইয়া বাইত। অক্ষর পরিচয়, মুখস্থ ও লেখা এক সঙ্গে শিক্ষা হইয়াছিল। দেবদেবীর শত নাম, পিতৃমাতৃবংশের সাতপুরুষের “নাম স্লোক” সন্ধ্যার সহিত কুলপুরোহিতের কাছে শিখিয়া ও মুখস্থ বলিয়া সে দিনের সমস্ত শিক্ষা সমাপ্ত হইয়া বাইত এবং তাহার পর শয়নের পূর্বে শীতকাল হইলে অগ্নি-কুণ্ডের চারিপার্শ্বে ও গ্রীষ্ম হইলে প্রাঙ্গণে বসিয়া বৃদ্ধ পুরাতন ভৃত্যগণের প্রমুখ্যায় “আরব্য উপন্যাস”, “গোলেবাকালী” ও “বিজয়বসন্ত” ও নানাপ্রকার গ্রাম্য রূপকথা শুনিয়া পিতৃমাতৃগণের সহিত শয়ন করিতে বাইতাম। তখন আবার শয্যার উপর যুক্তকরে বসিয়া দুর্গা কালী শিব রাধাকৃষ্ণ এবং প্রধান প্রধান তীর্থ গয়া কাশী ও নদ নদীর নাম গঙ্গা যমুনা ব্রহ্মপুত্র ইত্যাদি বলিয়া শয়ন করিতাম। প্রভাত হইতে রাত্রি পর্যন্ত বাহাই করি না কেন, সকল কার্যেই ভগবানকে স্মরণ করিতে হইত। প্রভাতে জীবন আরম্ভ, এবং নিশীথে কার্য শেষ তাঁহার নামেই করিবার নিয়ম ছিল। সেকালে বালক বিশেষতঃ বালিকাগণ অমনি বুধা মাংস খাইতে পাইত না। পূজার বলিদানের ছাগমাংস দেবীর প্রসাদস্বরূপ পূজার সময় ছেলেরা ভক্ষণ করিত, তাহাতে পলাণ্ডু দেওয়া হইত না, সে মহামায়ার ভোগের এক উপাদেয় রন্ধন, তাহা সচরাচর গৃহস্থ বাড়ীতে কখনও হয় না। ভোগের সে প্রসাদ যদিও কোন কুমারী কস্তা মাতার অল্পমতি লইয়া খাইতেন, বিবাহ পরে স্বশ্রমালয়ে কর্ণে মস্ত্র দেওয়া হইলে শান্ত কস্তা কি বধূ আর কখন মাংস ভক্ষণ করিতে পারিতেন না, স্ব-ইচ্ছায় ছাড়িয়া দিতেন। গৃহিণীরা মনে করিতেন, মাতা মাংস ভোজন করিলে তাহার গর্ভজাত সন্তান রাক্ষস হয়। সেই ভয়েই শৈশবকাল হইতে মাংস নারীর পক্ষে অতি নিষিদ্ধ, এক্ষণে আমরা দেশের পূর্বকালীন আদর্শ হারাইতে বসিয়াছি ও অন্ত-দেশের ভাল কিছু গ্রহণ করিতে পারিতেছি না, ইহা আরও দুঃখের বিষয়।

সে কালে খাটী দুধ, সর, ছানা, দ্বত প্রচুর পরিমাণে পাওয়া হাইত। আমাদের গৃহে দৈনিক যোগান দুধ টাকায় ত্রিশ সের আসিত ও রাজে কর্তা হইতে রাখাল পর্যন্ত তাহা অতি তৃপ্তিসহ খাইতে পাইত, মাগ করিয়া কাহারো বাটীতে দিবার প্রয়োজন হইত না। নারিকেলমালা কঞ্চি বাঁশের সহিত হাতার জাল তৈয়ারী “ওড়ং” নামক পদার্থে সেই কার্য হইত। টাকায় চারি সের “জলবৎ তরলং” দুধ সস্তর্পণে ভাগ করিবার ক্লেশ স্বীকার করিতে হইত না।

সেকালে আমার মাতুলালয়ে দুধ জালের এক পৃথক ঘর ও দাসী ছিল, তাহার প্রতিদিনের কার্য দুধ জাল দেওয়া, ক্ষীর, সর, ছানা ও দ্বিধি প্রস্তুত করা। কর্তা দ্বাবু ও ছেলেরা, কস্তা গৃহিণীগণ দুইবার দুধ সেবন করিতে পাইতেন। রাজে একবার দাস দাসীরা সকলেও সেই সঙ্গে পাইত। এখন যেমন কেবল দুধ চুরি শুনিতে পাই, তখন এরূপ শুনিতাম না। পরিচারক ও পরিচারিকা-দ্বিগের উপর ঐ সকল কাজের ভার যেমন ছিল, তাহারাও স্বচাঞ্চল্যে তাহা

নির্বাহ করিয়া প্রভুপন্থীর বিশ্বাসভাজন থাকিয়া আমরণ একাই প্রভুর গৃহে জীবন অতিবাহিত করিত। পূর্বে বাগের রায় মহাশয় ( আমার মাতামহ ) গণের গৃহে সব ক্রীতদাস ও দাসী থাকিত। দশ বার কাহন কড়িতে ক্রয় বিক্রয় চলিত, টাকা পয়সা সাধারণ লোকে বড় ব্যতীত না ; হাট বাজার ঐ কড়ি দ্বারা হইত। বড় বড় কার্যে—উপনয়ন, দুর্গোৎসব, বিবাহ ও অন্নপ্রাশন প্রভৃতি ব্যাপারে—টাকা পয়সার খরচ দেখা বাইত।

শৈশবে আমরা পল্লীগ্রামের স্বচ্ছ নীল আকাশের নিম্নে মুক্ত বায়ুতে প্রকৃতি-মাতার অব্যাহিত স্নিগ্ধ শীতল কোড়ে সকল দিন পড়িয়া ঘুলিকর্দম খেলায় মাহুয, সহরের রুদ্ধ বায়ু, প্রাক্‌গহীন গৃহ, রাজপথ পার্শ্বের গাড়ী ট্রাম চলার বিরাট শব্দের মধ্যে যে সকল বালক বালিকা পরিবর্তিত, তাহাদের স্বাস্থ্য আর আমাদের স্বাস্থ্য আকাশ পাতাল প্রভেদ। নিদাঘ রোজ, বর্ষার বারিধারা তখনকার বালক বালিকার ক্রীড়ার সামগ্রী ছিল, তাহাতে কোন পীড়া হইত না। বর্ষার বুষ্টিজলে যে স্নান করে নাই, তাহার শৈশব কৈশোর বুথায় গিয়াছে। বুষ্টিজলে ভিজিয়া শিল কুড়াইয়া তাহার দ্বারা মোয়া প্রস্তুত করিয়া গোলা ছোঁড়াছুঁড়ী খেলায় যে জিতিয়া বাইত, সেদিন দলের সর্দার গণ্য হইয়া সে বুদ্ধগণের নিকট হার জিতে পুরস্কার পাইত। আহার বিহার, চলা ফেরা সকল বিষয়ে এখন যে সকল পরিবর্তন ঘটিয়াছে, তাহাতে স্বাস্থ্যও দিন দিন নষ্ট হইয়া বাইতেছে। দেশব্যাপী দারুণ ম্যালেরিয়ার করাল কবল হইতে রক্ষা পাইয়া যে কয়দিন বাঁচা যায়, সেই সৌভাগ্য। আগেকার ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর মহামারীর গল্পও একটা ইতিহাস বিশেষ। বৃদ্ধ আত্মীয় স্বজনের প্রমুখ্যে তাহার কথা শুনিতে পাওয়া যায় ; কিন্তু তাহা কত বৎসর অন্তর দুই একবার ঘটিত ; আর এখনকার ভয়াবহ রোগ ডিপ্‌থিরিয়া টনসিলাইটিস, এপেণ্ডোসাইটিস, ম্যারিগঞ্জাইটিস প্রভৃতির চিরবাসস্থান গৃহস্থের পুত্রকন্তার শরীরে ও ধনবানের গৃহে কায়েমি বন্দোবস্ত হইয়াছে। আজকালের পিতামাতার প্রতিদিনের জীবন সন্তানের স্বাস্থ্য লইয়া অশান্তির আকর হইয়া উঠিয়াছে। এ সকল রোগ বিদেশী আমদানী, কালের পরিবর্তনে সমস্ত অগ্রদূত হইয়া গিয়াছে ; এই সকল নূতন নূতন ব্যাধি পীড়াও তাহারই অনিবার্য ফল। মিশ্রিত কৃত্রিম দুগ্ধ, দ্রুত ও টিনজাত অতি পুরাতন আহারীয় নানা রোগ আনয়ন করে।

### মাস-মহাত্ম্য।

পূর্বে বৎসরের তিন মাস কাস্তিক, মাঘ ও বৈশাখ পুণ্য মাস বলিয়া গণ্য হইত। কাস্তিকে আকাশ প্রদীপ দেওয়া, যমপুত্র পূজা, ব্রাহ্মণ ভোজন, চণ্ডী-পাঠ, দান, মাঘে প্রাতঃস্নান, পূরণ শ্রবণ, বস্ত্র বিতরণ, গৃহদেবতাকে শিঠা পরমাত্র ষিচড়ী ভোগ দেওয়া প্রায় প্রতিগৃহে চলিত। বৈশাখ উৎসব মাস, সংক্রান্তি

হইতে আরম্ভ করিয়া প্রত্যহ ত্রতনিয়মের ধুম পড়িয়া বাইত। জলদান, ফলদান, নিত্য স্নানরী (পুনর্জন্মে নিরুপমা স্নানরী হইবার জন্ত) জন্ম এয়তিব্রত, দৈব-তাকে ভোগ, নারায়ণের মন্তকে বরণা এবং শাস্ত্রশ্রবণ ও শতনাম কীর্তন হইত। দিনে গৃহিণীদিগের একেবারেই অবসর থাকিত না। সন্ধ্যাসমাগমে গৃহবিগ্রহের জন্ত গন্ধমাল্য রচনা করা এবং চণ্ডীমণ্ডপের দালান স্বহস্তে শীতল জলে ধুইয়া বস্ত্রাঞ্চলে মুছিয়া শীতলপাটা বিছাইয়া জলযোগের আয়োজন করিতেন ও সমাগত আত্মীয় স্বজন গুরু পুরোহিতদিগকে পরিতোষপূর্বক শীতলভোগ খাওয়াইয়া কৃতার্থ হইতেন। পরে দাসদাসী প্রভৃতিও প্রসাদ পাইয়া আত্মাদিত মনে আবার প্রজাবর্গকে সন্তঃপুর বাহিরে খাওয়াইতে বাইত। রাত্রি এক প্রহর পর্যন্ত এই স্নান সন্মিলন ও ভোজনের উৎসবে প্রাণ পূর্ণ থাকিত। আমরা বালকবালিকা সকলে মিলিয়া ঘরে ঘরে দেখিয়া বেড়াইতাম, এবং কাহার বাড়ীতে কিরূপ শীতলভোগ হইয়াছে তাহার সমালোচনা করিতে ছাড়িতাম না। আষাঢ়মাসে আম কাঁটালের আদানপ্রদান এবং অল্পগত জনের প্রাপ্য নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে হইত। আম কাঁটাল রসসহ ক্ষীর, দধি, ঘোল, আঁটান দুধের সন্মিলনে চিড়া খই দিয়া উপায়ে আহারের একটা উৎসব ছিল। সেটা প্রায়ই বৈকালিক এবং মহিলাদিগের মধ্যে চলিত ছিল। ব্রাহ্মণদিগকেও আম খাওয়ান প্রথা ছিল। কেহ এক শত পক আত্র এমং জলপানের পূর্বে সের খানেক মিষ্টান্ন অনায়াসে সমাধা করিয়া রাত্রে আবার রীতিমত অনাহার করিতেন। গ্রামে সেই সকল চিহ্নিত ব্রাহ্মণেরা “মুনকে রঘু”, “সেরকে ন ঠাকুর” প্রভৃতি নামে অভিহিত ছিলেন। আহার গৌরবে পিতৃমাতৃদত্ত প্রকৃত নাম লোপ পাইয়াছিল।

তাহার পর স্বথের আশ্বিন মাসে মহামায়ার আগমনে বঙ্গদেশের রোগশোকের দুঃখদৈন্তের বেন অবসান হইয়া বাইত। অনাথ আতুরও তিন দিনের জন্ত আপন জীবনের অসীম অন্নকষ্টের কথা অনাহার ক্লেশ ভুলিয়া ধনীর দ্বারে সাদরে আহুত হইয়া প্রসাদ পাইত। দয়াবান গ্রামবাসী মধ্যবিত্ত গৃহস্থ হইয়াও অকাতরে অন্ন বস্ত্র দানে দরিদ্রকে পরিতুষ্ট করিয়া জীবন সার্থক জ্ঞান করিতেন। এই তিন দিনে জাতি বিচার নাই, ব্রাহ্মণ চণ্ডাল একই মাতৃ প্রসাদের অধিকারী। বৎসরে চারি পাঁচ মাস ধনীর দ্বার দরিদ্রের জন্ত উন্মুক্ত থাকায় সেকালে এত অন্নকষ্টের হাহাকার শ্রবণি ছিল না, এক মুষ্টি অন্ন পল্লীর সর্বত্র মিলিত। এখন সেই ধর্মের শিথিলতায় আত্মস্বথমুগ্ধতায় এত বাহুল্য ব্যয় আসিয়া পড়িয়াছে, যে নিতান্ত আপনার জনেরই বিপদে সাহায্য করা কষ্টকর কার্য।

### মলচুরী।

সেকালে একালে এই উভয় কালেই পল্লীগ্রামের জমীদার গৃহে কোন ক্রিয়া-কর্ম হইলেই ভোজ ফলাহারের আয়োজনটা একটু বিশেষরূপে করিবার প্রথা

দেখিতে পাওয়া যায়। এক দিনের কার্য হইলেও সেই সপ্তাহ পূর্বে কুটূর্ণ সমাগম, দেবকার্য, কালী, মঙ্গলচণ্ডী ও মঠের শিবপূজা, বেহুলার জাগরণ (জাগর) গীত প্রভৃতি নিয়মমত হইয়া থাকে। ছোট বড় প্রত্যেক কাজেই প্রচুর পরিমাণে লোকজন নিমন্ত্রণ করার নিয়ম, তাহার উপর গ্রামের চতুর্দিকের প্রজাগণ ত আছেই, দাসদাসী অল্পগত এবং অভ্যাগত অতিথিগণ কাহাকেও বাদ দেওয়া যায় না, কাজেই খাওয়াইবার ব্যয় ও তাহার নিমিত্ত পরিশ্রমও বেশী হইয়া পড়ে। ছোট তরফের আমার মধ্যম জ্যাঠামহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র মোহিনী-চন্দ্রের অন্নপ্রাশনের সময়ও ইহার কোন প্রকার ব্যতিক্রম হয় নাই। আমার বয়স তখন দুই কি আড়াই, তথাপি একজন পুরাতন দাসী (চাঁদদিদি) আমার কার্যে নিযুক্ত ছিল, আমিও তাহার জিম্মায় সকল দিন থাকিতাম। সে বখন কোন কাজে বাধ্য হইয়া যাউত, তখন আমাকে কাছারী বাড়ীতে পাইক সর্দার কিংবা কোন আমলার হস্তে সমর্পণ করিয়া দিত। ছোট তরফ বড় তরফ এক বাড়ী, গৃহপ্রাচীর মাত্র ব্যবধান, তাহার কপাট খুলিলেই এক হইয়া যায়, তবে অকারণ দ্বয়ার মুক্ত করা হয় না, তাহাতে দাসদাসীতে সর্বদাই কলহের ভয়। সেদিন মেজ জ্যাঠামহাশয়ের প্রথম পুত্রের ভাত, বাড়ী লোকে লোকারণ্য, কে কাহাকে দেখে। আমার গাভ্রুরা অলঙ্কার, কাজেই চাঁদদিদি পিতার অল্পগত পাচক মহেশঠাকুরের হস্তে আমাকে দিয়া কার্যান্তরে চলিয়া যায়। আমিও ঘুমাইয়া পড়িলে মহেশদাদা অন্তঃপুরে লইয়া আমাকে শয়ন করাইয়া নিকটে পাহারা থাকে। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত মায়ের কোনই অবকাশ না থাকায় তিনিও একবার আমার তত্ত্বতল্লাস করিতে পারেন নাই এবং আমিও তেমনি ঘুমাইতেছি। তাহার পর সন্ধ্যা প্রদীপ জ্বলাইবামাত্র মা আহার সামগ্রী লইয়া আমাকে খাওয়াইতে আসিয়া দেখেন, আমি গভীর নিদ্রায় সেই প্রকাণ্ড শূন্য বাড়ীতে একা পড়িয়া আছি, কাছে কেহই নাই, কতক্ষণ যে, অনাহারে রহিয়াছি, তাহারও কোনরূপ সংবাদ জানিবার উপায় না থাকায় তিনি তাড়াতাড়ি আমাকে কোলে উঠাইয়া আহার করাইতে বসাইয়া দেখিতে পাইলেন, অন্য সকল গহনা আছে, কেবল পায়ের নূতন মল চারিগাছা নাই। তিনি প্রথমে মনে ভাবিলেন, হয়ত বিছানায় পড়িয়া আছে, পরে খুঁজিয়া না পাইয়া বাহির বাড়ীতে সংবাদ পাঠাইয়া দিলেন, তখন চারিদিকে গোলমাল, খোঁজ পড়িয়া গেল। চাকর দাসীর প্রাণান্ত উপস্থিত হইল ও জেরা সওল জবাব সবই সমানভাবে চলিতে লাগিল, কিন্তু অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত মলের কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। মহেশদাদাকে কেহ সে বিষয়ে কোন কথা জিজ্ঞাসা করাও উচিত মনে করিলেন না। কত লোক গ্রামান্তর হইতে আসিয়াছিল, সামান্য মলের জন্য অত গুণগোল না করাই ভাল ভাবিয়া পিতৃদেব নীরব হইয়া রহিলেন; কেবল আমার পিতৃঘণ্টাধুরাণীরা “স্বরত হালের” জন্য চারিদিকে গুপ্তচর নিযুক্ত করিয়া দিলেন। প্রথমতঃ, আমি পিতা-

মাতার প্রথম সন্তান, আমার গাজালঙ্কার চুরী যাওয়া অতীব অন্তঃকর্ণ, তাহার উপর, লোকের এত বড় সাহস, যে ছোট কর্তার কন্টার পায়ের মল দিনে দুপুরে চুরী এ কার্যের সমুচিত প্রতীকার না হইলে দিনেই ডাকাতি ও শিশুহত্যা প্রভৃতি হইবে, কঠোর শাসনের দ্বারা দাবীকে শাস্তি দেওয়া কর্তব্য। শিশুস্বাস্থ্যের এই দ্বন্দ্ব সঙ্গত কথার কেহ আর উত্তর করিতে সাহস পাইলেন না, চোরের অনুসন্ধান চলিতে লাগিল।

আমার অতি বাল্যের কথা এখনও মনে আছে এবং মাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়াছি, তৎকালে আমার বয়স তিন বৎসর মাত্র। তবে এ মলচুরীর কোন কথাই আমার মনে নাই, বারংবার শুনিয়া এমনি হইয়া গিয়াছে, যে আমি বেন সবই জানি, প্রকৃত পক্ষে ইহা আমার নিকট রূপকথার দ্বায়, শুনা মাত্র। নয় মাস বয়সে অন্নপ্রাশনের কোন গহনাই দুই আড়াই বৎসর বালক বালিকার গাজে কখনও হইতে পারে না, বিশেষতঃ মল ; কাজেই আমার মল আবার নূতন করিয়া প্রস্তুত করাইয়া দিয়াছিলেন, হাতে বিছাবালা হিন্দুস্থানী গড়ন। আমাদের অধিকাংশ গহনাই সেকালে পশ্চিমে ও সাজ সজ্জাও সেইরূপ ছিল। টানিলে বাড়িয়া বাইত, ভিতরে কল থাকায় টানিয়া ছোট বড় করা বাইত, বাহিরের লোকে সেটা জানিত না, সেইজন্য বালা চুরী না হইয়া মলই গিয়াছিল। দেখিতে দেখিতে পল্লীময় মলের সমাচার প্রচার হইয়া সর্বত্র “খানাতল্লাসী” হইয়াও সে বিষয়ে কোন কিছু আবিষ্কার হইল না, রাজিটা সকলেরই বড় অশাস্তিতে কাটিয়া গেল।

পরদিন বেলা প্রহরাভীত হইলে পিতৃঠাকুর সদর কাছারীতে বলিয়া কাজকর্ম দেখিতেছিলেন, মলের কথা তাঁহার মনেও ছিল না, এমন সময় আমাদের সাতপুরুষের খাসের প্রভা (সবৎসর গহনা প্রস্তুত করিয়া দিত, খাজনা দিতে হইত না) রামজয় পোদ্দার আসিয়া প্রণাম করিয়া যুক্ত করে দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিল, “হজুর, মাসখানিক আগে এই “খাড়ে” (মল) আমি নিজের হাতে কুকী (খুকী) ঠাকুরঝির জন্ত তৈয়ার করিয়াছিলাম। কাল সরকারী বাড়ীর এক ছোকরা (মহেশঠাকুরের বয়স তখন ২০১০, পাতলা ছিপছিপে শ্রামবর্ণ ব্রাহ্মণ, গলায় একগুচ্ছ উপবীত মালার মতন তুলিত) আমার কাছে ইহার দর বাচাই করিতে লইয়া গিয়াছিল। আমি চিনিতে পারিয়া আর ফিরাইয়া দেই নাই। দশ টাকার “খাড়ে” সাত টাকায় রফা করিয়া ২ টাকা বায়না স্বরূপ দিয়াছি। তখন তখন কিছু না দিলে সে ছাড়ে না, জিনিস লইয়া চলিয়া আসে, হাতে রাখিবার ফন্দীতে দিতে হইয়াছে। আপনি সমস্ত চাকর ডাকিয়া আনুন, আমি সনাক্ত করিয়া দিতেছি, কে চোর।” এই কথা শুনিবামাত্র পিতৃঠাকুরের মনে হইল, “আমার মহেশ ত না? সে যে আমার অনেক দিনের আনীত ও অতি বিশ্বাসভাজন, আমার অঙ্গে প্রতিপালিত।” পোদ্দারের কথায় তৎক্ষণাৎ

দুই তরফের চাকরে প্রাঙ্গণ ভরিয়া গেল ও একে একে রামজন্মের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতে লাগিল। তাহাদের মধ্যে একজনও নহে দেখিয়া পোন্ধর নীরবে দাঁড়াইয়া ভাবিতেছিল, এমন সময় এই লোকারণ্য ভেদ করিয়া দেই আমাকেই ক্রোড়ে লইয়া হঠাৎ মহেশঠাকুর তথায় উপস্থিত হইবামাত্র, রামজন্ম পোন্ধর সজোরে তাহার হস্ত ধরিয়া চৌকায়স্বরে বলিয়া উঠিল, “হজুর এই ঠাকুর আপনায় মেয়ের মল চুরী করিয়াছে, ইহাকে কোতোয়ালীতে, থানায় পাঠাইয়া শাস্তি দিন। এমন ভয়ানক কাজ, ছোটছেলের গায়ের গহনা চুরী, মারিয়া যে ফেলে নাই সেই ভাগি।” লজ্জা ও দুঃখে অনেকক্ষণ পিতৃদেব কাহারো মুখের দিকে তাকাইতে পারিলেন না, তাহার পরে মন্তক উঠাইয়া, দয়ার্জ করুণহৃদয় পিতা গম্ভীরভারে কহিলেন, “কে আছ, মহেশকে পাবনা জেলার সীমানা পার করিয়া দিয়া এস ও মুরশিদাবাদ বাওয়ার পাথের দিয়া দাও।” আর মহেশকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “মহেশ, তোমার কোল হইতে আমার মেয়ে নামাইয়া দিয়া সম্মুখ হইতে চলিয়া যাও, আমি তোমাকে দেখিবার কষ্ট সহ্য করিতে পারিতেছি না, আমার স্নেহ দয়ার উপযুক্ত প্রতিদান দিয়াছ।” মহেশঠাকুরকে কোন উত্তর দিবার অবসর দেওয়া হইল না, তখন চারিজন পাইক আসিয়া তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া গেল।

সেদিনের মত কাছারী ভাঙ্গিয়া যে বাহার স্থান চলিয়া গেল। আমাদের বাড়ীতে এক নিরানন্দের ছায়া পাতে সকলই অন্ধকারে ঢাকিয়া ফেলিল। বিদেশী বালক, অনাথ বালক মহেশ, বাল্যে আমার পিতার আশ্রয়ে মাহুষ হইয়া পরিশেষে তাঁহারই কন্ডার পায়ের মল চুরী করিয়া এমন একটা তীব্র ব্যথা তাঁহার মনে দিল, যে বহুকাল তাহার স্মৃতি মুছিয়া ফেলিতে পারা তাঁহার পক্ষে কঠিন হইয়াছিল। যখন তখন তিনি আক্ষেপ করিয়া বলিতেন, “দরকার ছিল ত আমাকে সে কেন তাহা বলিল না, আমি সাতের বদলে দশট তাহাকে দিয়া দিতাম, সে কেন এমন কাজ করিল।”

সময় যেমন চলিয়া যায়, তেমন চলিয়া যাইতে লাগিল, আমরাও ক্রমে সব বড় হইয়া উঠিতে লাগিলাম। এই ঘটনার সাত আট বর্ষ পরে প্রচণ্ড আশ্বিন মাসের ঝড়ের পরই আমার বিবাহের মহাধুম পড়িয়া গেল। সে বিবাহ উৎসব রাজসাহী জেলার একটা স্মরণীয় দিন, অখমেধ বস্তু বিশেষ। অনেক কাল তেমন জাঁকের বিবাহ সে অঞ্চলে হয় নাই। নানাদেশ হইতে নানাপ্রকার দ্রব্যসম্ভার লইয়া লোকজন আসিয়া আমাদের ঠাকুরবাড়ীতে কায়েমী বন্দোবস্ত করিয়া বলিয়াছিল। যাত্রাওয়ালা, বাজকর, কীর্তনী, বাই, ভাঁড়, বাজিকর এবং বহুবিধ শাল শাড়ী স্বত্বে কাশী অব্যতসহরবাসীরও অভাব হয় নাই। সিধা বিতরণ ও শতাধিক জনের আহার প্রস্তুত করিতে গৃহের বধূগণ ও গৃহিণীরা পরিশ্রান্ত বোধ করিতেন। রাজসাহী হইতে হালুইকর ব্রাহ্মণ আনয়নার্থে লোক পাঠান হয়।

যাহারা এ সকল 'সরবরাহ' করিত, এক সঙ্গে অত লোক দিতে না পারায় আমাদেরই ভৃত্যগণ চারিদিকে খোঁজ করিয়া ব্রাহ্মণ সংগ্রহ পূর্বক হরিপুর রওনা হইয়া আইলে। সেই দলের ভিতর যে সেই মহেশদাদা ও তাহার জ্যেষ্ঠ ছিল, তাহা আমাদের লোকেরা চিনিতে পারে নাই।

অপরায়ে জ্যেষ্ঠতাত, খুল্লতাত, জ্ঞাতিকুটুম্বসহ পিতৃদেব আদিনায় বসিয়া সব তত্ত্বাবধান করিতেছিলেন, সেই সময় রাজসাহীর "ভিয়ানের" ব্রাহ্মণগণ আসিয়া পৌছিল ও সবাই নমস্কার করিয়া দূরে দাঁড়াইল, কেবল একজন মাত্র আধাবয়সী ব্রাহ্মণ তাঁহার পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করিতে অশ্রুজলে তাহা সিক্ত করায় তিনি চমকিয়া চাহিয়া দেখিলেন, চিনিতে পারিলেন না কে। সাত আট বৎসরের দারুণ মানসিক কষ্টে ও অহুতাপে অকাল বার্দ্ধক্যে, তাহার চেহারা একেবারে পরিবর্তিত হইয়াছিল, সে "মহেশদাদা" আর ছিল না। ৩৭৩৮ বর্ষেই জীর্ণ শীর্ণ বৃদ্ধ প্রাপ্ত হইয়াছিল। সে অতি ধীরে অশ্রুক্ষকর্ষে কহিল, "আমি আপনার সেই হতভাগ্য মহেশ, পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হইয়া আবার আপনারই ঘরে আসিয়াছি।" পিতৃদেবের হৃদয় মমতায় দ্রবীভূত হইয়া তাঁহারও নয়নে জলধারা বহিতে লাগিল। তিনি হস্ত ধরিয়া তাহাকে উঠাইয়া অন্ত সব কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, সেই মুহূর্ত্তে মহেশঠাকুরের এই অপ্রত্যাশিত আগমন বার্তা চারিদিকে প্রচার হইতে না হইতে তখনকার প্রাচীন পরিচারকবর্গ তাহাকে দেখিতে আসিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। সে এক বিয়োগান্ত নাটক অভিনয়।

মহেশদাদা কতক প্রকৃতিস্থ হইয়া আমাকে সর্বপ্রাণে দেখিতে চাহিল। পিতৃদেব কোন বিধা না করিয়াই তাহাকে অন্তঃপুরে বাইবার আদেশ দিলেন, তখন আমি বিয়ের 'কনে' বহির্কোণীতে বাইতে পারি না, আমার পিতৃবল্য-ঠাকুরাণীদিগের অনেকেই চৌদ্দ পনের বৎসরে বিবাহ হইয়াছিল, কিন্তু আমার ভাগ্যে সেই একাদশ বর্ষে পদার্পণ করিতে না করিতেই বিবাহ হইয়া যায়। আশ্বিনে দশ উত্তীর্ণ, কান্তিকে "শুভপরিণয়", মহেশদাদা প্রাণের আবেগে ও পূর্বকথা স্মরণ করিয়া দশমবর্ষীয়া আমাকে জোড়ে তুলিয়া লইবার জন্য হস্ত প্রসারণ করিয়াই শিশুর ন্যায় ক্রন্দন করিতে লাগিল, সে আর এক করুণ দৃশ্য। মা পিসিমা প্রভৃতিও তাহার সহিত রোদন করিয়া ফেলিলেন। সেইদিন হইতে আমরণকাল পর্যন্ত মহেশদাদা আমাদের পরিবারে থাকিয়া জীবন কাটাইয়া গিয়াছে, তেমন বিশ্বস্ত ভৃত্য ও স্নেহীল সেবক বন্ধু আমাদের আর কেহ ছিল না। তবুও যখন তখন মহেশদাদা গত জীবনের সেই একদিনের ভাস্কর্য্য কাঙ্ক্ষিত কথা জুলিতে পারে নাই। ভগবান তাহাকে কেন যে এ "কুগ্রহের দৃষ্টি" হইতে তখন রক্ষা করেন নাই" সেই তাহার চির কোভের কারণ ছিল। তাহার দেহ মনের উপর যে অশুশোচনা যুগান্তর আঁকিয়া দিয়া পূর্ণ বৌবন অসময়ে হরণ করিয়াছিল, তাহার প্রত্যক্ষ চিহ্ন সকলেই স্বচক্ষে দেখিয়া কত ব্যথিত



হইয়াছিলেন এবং স্বয়ং মহেশ ঠাকুরও তাহার নিজ কৃত সেই অবৈধ কার্যের নিগূঢ় রহস্য ভেদ করিতে না পারিয়া পরবর্তী কালে জীবনসম্বন্ধায় সময়ে সময়ে গোপনে অশ্রুজল ফেলিত, শুনিয়াছি। মহাশয় জীবনের পাপপুণ্যের বিচার ও স্বধর্মের অহুত্ব সর্বকালের নিকট এক নহে। একজন হয়ত আজীবন নিত্য সূচায়িত পাপ নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য অন্তের সর্বনাশ করিয়া লোকের চক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া ধরা না পড়াই সৌভাগ্য মনে করে, আবার কেহবা একদিনের সামান্য ভুলের নিমিত্ত চিরকাল অহুতাপানলে জলিয়া পুড়িয়া মরে। মানুষে মানুষে ভিন্নতা এই।

পিয়ানো শিক্ষা রহস্য।

আমাদের চৌধুরী বংশের সেকালের দুহিতারা পিতৃগৃহবাসের মোরসী পাট্টা হস্তে পূণিবীতে জয়গ্রহণ করিতেন। তাহার মধ্যে আমিও একজন। সে বন্দোবস্তে কাহাকেও কোন সাংসারিক বস্তুট বহিতে হইত না, দিব্য আরামে জীবন কাটিয়া বাইত, কল্যাণেও তাঁহাদিগের স্বল্পে কোনও ভাবনা ছিল না। মেয়েরা সকলে দেখিতে পরম সুন্দরী থাকায় ধনীর ঘরে বিবাহ হইয়া বাইত, ব্যয় মাতামহকে বহন করিতে হইত, উপরন্তু কোন দিকে কিছু ক্রটি হইয়া বাইলে আবার মান অভিমানের পালায় কর্তৃপক্ষকে ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিতে হইত। নিঃসন্তান বালবিধবা পিতৃসগাঠাকুরাদিগের মধ্যে দুই একজনের একাধিকবার শ্রমুরালয়ে যাওয়া ও বৈধব্য ঘটিয়া সর্ববাস্তব অবস্থায় পুনর্ব্বার পিতৃশ্রমুরালয়ে প্রত্যাবর্তনের কাহিনী প্রাচীনাঙ্গের প্রমুখ্যে আজও শুনিতে পাওয়া যায়। সে দুর্ভাগ্যের ইতিহাস জনসমাজে অজ্ঞাত থাকাই বাঞ্ছনীয়। বাধ্য হইয়া কুলীন পাণ্ডে বংশাঙ্কুরে কল্যাণ করিয়া পূর্বপুরুষগণও কতিপয় হইয়াছিলেন।

শেষবে আমিও দুই চারি বার শ্রমুর গৃহে গিয়াছিলাম, কিন্তু শ্রমুরাতাকে কল্যাণ দেখাইতে যাওয়াই আমার শেষ গমন। বিবাহান্তে আমাকে পুত্রদিগের স্নায় রীতিমতন সর্ববিদ্যায় বিশারদ করিতে পিতৃঠাকুরের একান্ত চেষ্টায় ও বস্ত্রে অনেক মেম নিযুক্ত হইয়া গৃহে আসিতেন। তখন আমরা শোহরে, মিসেস জ্যাক্ (যাহাকে আমাদের বাড়ীতে “ববের মা” নামে ডাকিতেন) আমাকে নানাবিধ শিল্প ও ইংরাজী কথোপকথন শিখাইতেন। তাহার ফলাফল এক্ষণে পূর্বকথায় স্মৃতিমাত্র। আমার ও ভ্রাতা শ্রীমান আশুতোষের বিদ্যাটা বন্ধুগণের মধ্যে অসময়ে প্রচার হইয়া গিয়াছিল। কেহ আসিলেই আমাদিগকে কবিতা আবৃত্তির জন্য পিতৃদেব আহ্বান করিয়া পাঠাইতেন, আমি হেম বাবু ও মাইকেল দত্ত, আশু পেকপিয়ার, শেলী ও বাইরান মুখম্ব বলিয়া সকলকে পরিতৃপ্ত কি জালাতন করিতাম, তাহা জ্ঞাত নহি, তবে পিতৃ আজ্ঞা লম্বন করিবার ক্ষমতা ছিল না। এখনকার পুত্রকল্যাণ স্নায় আমরা কখনই “না, পারি না, মনে নাই”

বলিতে পারিতাম না। আত্মীয় সমাগম হইলেই আমাদের ভ্রাতাভগিনীকে যে ইনুতাহাম (পরীক্ষা) দিতে হইবে, সেটা আমরা আগেই জানিয়া প্রস্তুত হইতাম। ক্রমশঃ পদ্ম গম্ভ “গ্রাম রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া অপ্রতিহত প্রভাবে রাজ্য-শাসন ও অগত্যনির্বিশেষে প্রজাপালন” হইতে আরম্ভ করিয়া শেষে গান বাজনার “মহলা” দিতে হইত। আমার সঙ্গীত শিক্ষার জীবন্ত প্রমাণ স্বরূপ অত্যাশি আমি “খোস মেজাজে বাহল তবিস্বাতে বিত্তমান”। প্রবল অরাক্রান্ত হইলে অবাচিতভাবে অল্প সব উপসর্গ সহ সঙ্গীত আসিয়া এখনও আমার স্বন্ধে ভর করে, সেটা আমার পৈতৃক সম্পত্তি, উত্তরাধিকারী সর্ব্বে প্রাপ্ত।

সেকালে ওস্তাদের সম্মুখে আমাদের (মেয়েদের) বাহির হওয়া সম্ভবপর ছিল না, তাহাদের নিকট গান বাজ শিখা করা ত একান্ত অসম্ভব ব্যাপার, কাজেই আমার মেম শিক্ষয়িত্রী ছিল, তীক্ষ্ণবুদ্ধি আশু পুস্তক দেখিয়া হারমোনিয়াম শিখা করিতেন।

আমি কৃষ্ণনগরে প্রথমে আসিয়া রোমান ক্যাথলিক নানদিগের নিকট পিয়ানো শিক্ষার্থে বাইতাম। তাহার পর অশীতি বর্ষীয়া মিস্ টবি হইতে আরম্ভ করিয়া সে সময়ে আমার সমবয়সী কুমারী ডুবালা পর্য্যন্ত সপ্তাহে দুই বার আমাকে পিয়ানো শিখাইতে আসিতেন। কাশীর রোগীর রোগ পরীক্ষার্থে বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ যেমন তাহার বক্ষে কল লাগাইয়া ঠুকিয়া ঠুকিয়া এক, দুই, তিন one, two three বলেন ও বলান আমার অঙ্গুলিও সেইরূপ মুক্ত পিয়ানো বক্সের উপর ঢং ঢং আওয়াজ করিতে করিতে one, two, three গণিত, তালমানের চিহ্ন কোথায়ও পাওয়া যাইত না। চিকিৎসকে বক্সের ভিতরের ফুসফুসের রোগ নির্ণয় করেন, আর আমি বাজবক্সের ঢং ঢং বাজ শব্দের সহিত ঐক্যতানের অমিল ধরিতে পারিতাম না; অথচ অভ্যাস করিতে করিতে অঙ্গুলী অবশ হইয়া যাইত। ক্রমে ঢিমে তেতালায় গড়াইয়া গড়াইয়া ইংরাজী waliz ওয়ালিসে যেদিন পৌছিলাম, সেদিন আমার শিক্ষয়িত্রী কুমারী ডুবালা নাচিবার নিমিত্ত আনন্দে অগ্রসর হইয়া আমাদের বৈঠকখানায় এক বার ঘুরপাক খাইতেই তাল কাটিয়া উচ্চ হাস্তে তিনিও বসিয়া পড়িলেন। আমিও সমস্বরে হাসিতে যোগ দিয়া পিয়ানোর বক্স দ্বার চির রুদ্ধ করিয়া দিলাম। সৌভাগ্য বশতঃ দ্বিপ্রহরে গৃহে কেহ থাকিতেন না এবং পুরাকালের ইঙ্গমভা ছিল না, নতুবা বাজবিভ্রাটে আমাকে শাপভট্ট হইয়া কোথায় যে এতদিন ঘুরিতে হইত, তাহার ঠিক ঠিকানা থাকিত না। নর্তুকীও যে অমনি অব্যাহতি পাইতেন, এমন হইতে পারে না, তবে শান্তিটা আমারই বেশী হইবার কথা।

পিয়ানো বিজ্ঞা তো এখানেই শেষ হইয়া গেল, নাম বশ তেমনই চতুর্দিকে পরিব্যাপ্ত থাকায় নদীয়ার জজ রিচার্ডসন ও চব্বিশ পরগণার কমিশনার চাপম্যানের পত্নী জেলায় পদার্পণ করিয়াই আমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে

আসিলেন। উভয় মহিলাই খুঁট ধর্মে গভীর বিশ্বাস থাকায় যে কোন প্রকারে সম্ভ্রান্ত বংশীয় একজন বঙ্গনারীকেও পরিজ্ঞানের পথে আনয়ন করিতে পারিলে জয় সার্থক জ্ঞান করিতেন। এই দুই মেঘ সমাগমে আমরা সকলে সাধ্যানুসারে আদর যত্নের কোনই ক্রটি করিলাম না। কথাবার্তা ভ্রোচিহ্নিত সমাদর সমান ভাবে চলিবার পর ইংরাজ রমণীদ্বয় আমাদের বাজনা শুনিবার আগ্রহ প্রকাশ করায়, তাহা বাজালা গৎ হারমনিয়ামে বাজাইয়া শুনাইয়া ধন্যবাদ পাইলেন, তুলচুক ধরিবার কিছু ভয় ত ছিল না, আমার পিয়ানো ইংরাজী পিস্ ( piece ) বাজাইতে হইলে, বাহা ইচ্ছা তাহা করিলে চলিবে না। বিচার পরিচয় ঠাকুরাণী ডুবাল ইহার পূর্বে খুবই পাইয়াছিলেন ( যদিও তখন পর্যন্ত তিনি আমাকে শিক্ষা দিতে ছাড়েন নাই )। তবুও আমি বাজাইবার জন্য মুক্ত পিয়ানো সম্মুখে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া নীরবে বসিয়া রহিলাম, তাঁহারা ভাবিলেন, ইয়ং লেডীদিগের স্বভাবই এইরূপ, জানিয়াও সহজে গুণ প্রকাশ করিতে চান না, লজ্জা দেখান, সে বাহা হউক, আমি মহা সমস্তায় পড়িয়া শুকনা ডাকার হাবুডুবু খাইতেছি, ঠিক সেই সময়েই নানাবিধ উপদেশ্য খাণ্ড এবং তুষার শীতল লেমনেড প্রভৃতি আসিয়া পড়ায় বাজনার হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়া ততোধিক এক অভিনব বিপদে পড়িয়া গেলাম। সহসা জজ পত্নী সাগরে আমার হস্ত ধরিয়া এক পায়ে আগরার্পে ডাকিয়া পার্শ্বে বসাইলেন। তখন আমরা ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য কাহারও স্পৃষ্ট খাদ্য কখনও স্পর্শ করিতাম না। অযাচিত স্নেহে অত্যন্ত ভীতভাবে পিতৃদেবের দিকে চাহিলাম, তিনি ইঙ্গিতে খাইতে আজ্ঞা দিলেন, অগত্যা মেঘ মহোদয়ার সঙ্গে একত্রে মিষ্টান্ন খাইয়া সেই মুহূর্ত্তে জাতিচ্যুত হইলাম। পিসিমাতারা যবনিকার অন্তরাল হইতে জাতিনাশের ব্যাপার স্বচক্ষে দেখিয়া অতীব ব্যথিত হইয়া সেই দিন হইতে বহুকাল আমার হস্তে ফল ভিন্ন অন্য কোন সামগ্রী আর খাইতেন না এবং নিশীথে তাঁহাদিগের নিকট প্রার্থনীয় শয়ন করিতেও দিলেন না। পরদিন অতি প্রত্যুষে স্নানান্তে জাহ্নবীর পবিত্র সলিল আমার মস্তকে, গাত্রে দিয়া ও তাহা পান করাইয়া বাহু কতকটা তাঁহারা পরিতুষ্ট হইলেন। কিন্তু অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে সে জাতিনাশের কোড়টা চিরকাল রহিয়া গিয়াছিল। সম্ভ্রান্ত স্নেহের আধিক্যের নিমিত্ত মুখে কোন দিন সে প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া আমাকে পরে কখনও কিছু বলেন নাই। বড় হইয়া যতবারই সেই সাক্ষ্য ঘটনা ও মাতৃসমা স্নেহময়ী পিতৃদ্বন্দ্বা ঠাকুরাণীদিগের মনে অবধা ক্লেশ দেওয়ার কথা ভাবিয়াছি, ততবার হৃদয়ে বেদনা বোধ হইয়াছে, কখনও বা নেজে জলধারা বহিয়াছে। কৈশোরে বাহা কোতুকাবহ মনে হইয়াছিল, জীবন মাধ্যাহ্নে তাহা আবার অস্থধকর ঘটনার ব্যথা স্বরূপ স্মৃতিতে পরিণত হইয়া আছে। মানসিক দুর্বলতা, অপক্ক বুদ্ধি এবং বয়সের দোষে ঐ কাজ করিয়া-ছিলাম। ইহার মূল কারণ, আমার পিয়ানো শিক্ষার বৃথা ও মিথ্যা বশখ্যাতি

আমাদিগের পিতৃকুলের সকল পুরোহিতেরা শ্রেষ্ঠ কুলীন ব্রাহ্মণ, লাহিড়ী ; চৌধুরী বংশে বংশপরম্পরায় পুরোহিত্য করার “চক্রবর্তী” উপাধি। দলিলপত্র জমা জমীর লেখা পড়ায় “লাহিড়ী” লিখিত হইলেও সর্বসাধারণে “চক্রবর্তী মহাশয়” নামে পরিচিত। কুলীনগণ পূর্বে শতাধিক বিবাহ করিতেন, তাহা একপ্রকার ব্যবসাই ছিল। সেই নজিরানুসারে অতি বৃদ্ধ গঙ্গাবাজী কুলীন ব্রাহ্মণগণের সন্ধান পাইবামাত্র বয়স্ক কন্তাদায়গ্রস্ত পিতা, পিতামহগণ সেই ব্যক্তির সহিত নিজ কন্তার বিবাহ দিতে পশ্চাৎপদ হইতেন না, বৈতরণীর ঘাটে কন্তা দিয়া অন্তর্জ্বলী করিয়া বাইতেন।

তনিতে পাওয়া যায়, আমাদিগের পুরোহিতদিগের আদি পুরুষের ভাগ্যে এমন একটা ঘটনা ঘটিয়াছিল।

লাহিড়ী মহাশয়েরা আমাদের গ্রামের অনতিদূরে সালখা নামক গ্রামে বাস করিতেন এবং এখনও করেন, সেখানে অন্য কোন লোকের বাস ছিল না, কেবল পুরোহিত ঠাকুরেরা আর তাঁহাদের আত্মীয় কুটুম্ব ও দাসদাসীর বসতি থাকায়, তাঁহারাই পল্লীর সর্বময় কর্তা ছিলেন। পণ্ডিতপ্রধান গ্রাম, টোল চতুষ্পাঠি প্রভৃতিতে বড় স্বন্দর ও সৌষ্ঠবময় ছিল। কত বিদ্যারত্ন, স্মারকত্ব, বিদ্যানিধি উপাধিধারী ব্রাহ্মণ ও ছাত্রগণের শাস্ত্রালোচনায় গ্রামটা তীর্থ বিশেষ হইয়া উঠিয়াছিল। কালের কবলে সে সকল কীৰ্ত্তি এখন ধ্বংসপুরে গিয়াছে।

রাজসাহী, পাবনা, গঙ্গাতীরে অবস্থিত নহে, সেইজন্য পূর্বকালের বৃদ্ধ বুদ্ধাগণ মৃত্যুর পূর্বাঙ্কে নৌকাযোগে গঙ্গা যাত্রা করিয়া মুরশিদাবাদ বাইতেন।

যাতায়াতে মাসাবধি সময় লাগিত। ঐ অঞ্চলের লোক প্রায়ই সম্পন্ন গৃহস্থ, সঙ্গে দুই চারিখানি বড় বড় পান্সী আত্মীয় কুটুম্বের পূর্ণ থাকিত। অভাব কিছু থাকিত না, গুরু পুরোহিতও সহবাজী থাকিতেন।

চক্রবর্তী মহাশয়দিগের আদি পুরুষ গঙ্গা যাত্রা করিয়া মুরশিদাবাদ বাইতে- ছিলেন এবং কোন এক গ্রামের ঘাটে দিনের আহাঙ্গাদির জন্ত নৌকা লাগাইয়া- ছিলেন। তাঁহার আগমনবার্তা অচিরে চারিদিকে প্রচার হইয়া পড়ায় এক কন্তাদায়গ্রস্ত ব্রাহ্মণ আসিয়া চক্রবর্তী মহাশয়ের পদপ্রান্তে পড়িয়া তাঁহাকে কন্তাদায় উদ্ধার করিবার নিমিত্ত ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণের করুণ রোদনে পীড়িত গঙ্গাবাজী চক্রবর্তী মহাশয় নিরুপায়ভাবে অগত্যা বিবাহ করিতে সম্মত হইয়া সেই দিন নদীতীরে গোপালিলয়ে শুভকার্য সম্পন্ন করিয়া আবাস মহাপ্রস্থানের পথে যাত্রা করিলেন। নববধু বিংশতিবর্ষীয়া স্বন্দরী যুবতী কন্তা অকালে বৈধব্যের সনন্দসহ বহুবিধ বস্ত্রালঙ্কার যৌতুকস্বরূপ জীঘন পাইলেন। তাঁহার স্বামী স্বকীয় প্রাণের আয়োজনার্থে বজ্রমানদস্ত সুবর্ণ অলঙ্কার বাজু, চুড়ী, পট্টবস্ত্র রোপ্য ও কাঁসার বাসন এবং মূল্যবান লামগ্রী বাহা কিছু

অভাব সময়ের জন্য সঙ্গে আনিয়াছিলেন, তাহার সকলই নবপরিণীতা বধূকে দিলেন। একেবারে রিক্ত হস্তে বৈধব্যের নিদারুণ বহ্নিতে দহু করিতে তাঁহার মনে দয়া হইয়াছিল। ব্রাহ্মণ নিঃসন্তান ছিলেন এবং ভগবানের কৃপায় অস্তিম কালের সেই বিবাহিত। পত্নীর গৰ্ভজাত পুত্রেই তাঁহার বংশ ও নাম রক্ষা হইয়া গেল। এই লাহিড়ী বংশ সেই এক পুরুষের ধনে পুত্রে লক্ষ্মীশ্বর।

এই পুরোহিত মহাশয়গণের পরবর্তী বংশধর ছোটকর্তার কোন সন্তান সন্ততি না হওয়াতে কর্তা গৃহিণী উভয়েই বড় মনোদুঃখে কালযাপন করিতেন। গৃহিণী ব্রত, নিয়ম, উপবাস, তীর্থ ভ্রমণ ইত্যাদি বহু কষ্ট করিয়াও যখন সন্তানের মুখ দর্শনে বিফল মনোরথ হইলেন, তখন স্বামীকে পুনর্ব্বার বিবাহ দিবার সম্বন্ধে গোপনে গ্রামে গ্রামে স্তন্দরী বয়স্কা কন্ডার সন্ধানে নিজ পরিচারিকা পাঠাইতে লাগিলেন ও পার্শ্ববর্তী গ্রামে সৰ্ব্বাংশে যোগ্য পাত্রীর সমাচার পাইয়া সইএর বাটী ব্রতের নিমন্ত্রণে যাইবার স্বামীর অহুমতি লইয়া তাঁহারই জন্য বিবাহের পাত্রী দেখিতে চলিয়া গেলেন। সেখানে যাইয়া মনোমত “কনে” দেখিয়া একেবারে বিবাহ স্থির করিয়া আনিয়া স্বামীকে ধরিয়া পড়িলেন। প্রথম অহুনয়, বিনয়, অহরোধ, তাহার পর কান্দা-কাটা, অনাহার এবং সকল ত্যাগ করিয়া শয্যা গ্রহণেও যখন কোনো ফলোদয় হইল না, তখন গুরুদেবকে আনাইয়া তাঁহার দ্বারা মত করাইয়া লইলেন। সে কালের দিনে ইষ্টগুরু আদেশ দেবতার দৈববাণীর দ্বারা অলঙ্ঘনীয় ছিল। গুরু আজ্ঞা অমান্য করিবার সাহস কাহারও ছিল না।

পতিকে বিবাহ দিয়া ছোটকর্তা প্রসন্নমনে নব বধূ গৃহে আনিয়া ছোট ভগ্নীর মতন তাহাকে আদর ও যত্নে কাজকর্ম শিখাইলেন এবং তাহাকে বসন-ভূষণে সজ্জিত করিয়া পতি সন্তাষণে পাঠাইয়া আনন্দানুভব করিতেন। প্রত্যহ গৃহদেবতা লক্ষ্মীনারায়ণ দেবের নিকট যুক্তকরে দাঁড়াইয়া সপত্নীর পুত্র কামনা করিয়া বলিতেন, “ছোট বোয়ের যেদিন পুত্র হইয়া আমার পুত্র্যপাদ স্বামীর আঁটকুড়ে নাম ঘুচিবে, সেদিন আমি আপনাকে একশ আট সোনার তুলসীপত্র দিয়া পূজা করিব এবং পুত্র জন্মের শুভ সংবাদ যে আনিবে, তাহাকে আমি যে দিকের কাণে শুনিব, সেই অঙ্গের সমস্ত গহনা পারিতোষিক দিব। ঠাকুর দয়া করিও।”

সময় কালীন ছোটবধূর সন্তান সন্তাবনা হইলে গৃহিণী তাহাকে পরম যত্নে উপায়ে খাণ্ডব্যাধি স্বহস্তে প্রস্তুত করিয়া করিয়া পাঠাইতেন। পরে মহা সমারোহে শাশুভক্ষণ করাইয়া পিত্রালয়ে পাঠাইয়া প্রত্যহ গৃহে শান্তি স্বপ্ৰায়ন ও “সত্যনারায়ণের কথা” দিতে লাগিলেন। একদিন অতি প্রত্যাষে কর্তা ঠাকুরাণী চণ্ডীমণ্ডপের বারান্দায় বসিয়া মালা জপ করিতেছিলেন, এমন সময় সপত্নীর পুত্র জন্মের সমাচার আনিয়া পৌছিল ও গৃহিণী দক্ষিণ কর্ণে তাহা শুনিয়াছিলেন বলিয়া সেই কাণের কড়ি, পিণ্ডলপাতা, হাতের বাজু কঙ্কণ শৌছা ও পায়ের

বাকমল খুলিয়া দিলেন এবং ঘরে গিয়া পরিধান বস্ত্র, পাটের শাড়ী, শীতের পাত্তের রেজাই, নিজের বিবাহের পট্টিবস্ত্র ও প্রাতঃসন্ধ্যার 'তাম্রকুণ্ড', 'আচমনী' প্রভৃতি পূজার সকল বাসন উপহার দিয়া সানন্দ মনে স্বামীকে বলিয়া কহিয়া সপত্নীর পিজালয়ে লোক সহ চলিয়া গেলেন। হৃতিকাগৃহে যাওয়া তৎকালে কেন এখনও সে প্রদেশের রীতি নহে, তথাপি পুরোহিত গৃহিণী সে বাধা না মানিয়া একেবারে হৃতিকাগৃহে প্রবেশ করিয়া নবজাত শিশুর প্রকৃত মাতা হইয়া জননীর করণীয় সকল কায়মনোবাক্যে করিতে লাগিলেন, বথার্থ মাতা কেবল শুভপান করাইতেন মাত্র।

পুত্রকন্টার জন্মের যে জাতক অশৌচ, তাহাকে আনন্দাশৌচ বলে, তাহাতে জ্ঞাতিগণের আহারাধির কোন পরিবর্তন নাই, কেবল দেবকাণ্ড, পূজা ইত্যাদি করিতে পারা যায় না। কন্টার জন্মগ্রহণে মাতা নবপ্রসূতা কন্টার একমাস, আর পুত্রের জন্মে মাতা ও পুত্রের একুশ দিন অশৌচ হইয়া থাকে। তাহার মধ্যে প্রসূতি গৃহান্তরে যাবতে কিবা কোন রূপ গৃহস্থালীর জব্যাদি স্পর্শ করিতে পারে না।

এই সময় চক্রবর্তী ঠাকুরাণীও সমানভাবে সপত্নী সহিত তেমনি থাকিয়া একুশ দিনে অতি সমারোহে শিশুর বগী পূজান্তে গ্রামস্থ সর্বসাধারণকে পরিতোষ-পূর্বক ভোজন করাইয়া সপত্নী ও নবজাত শিশুপুত্রসহ নিজালয়ে প্রত্যাবর্তন করিয়া ছোটকর্তাকে দিয়া স্বর্ণ বলয়ে পুত্রের মুখদর্শন করাইলেন। তাহার পর নারায়ণের মানসিকের স্বর্ণ তুলসী দান এবং অস্ত্রান্ত সকল দেবার্চনা করিয়া শিশুকে আপনার বথাসর্ব্বস্থ দিয়া প্রতিপালন করিতে লাগিলেন।

মহুগু জীবনের আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত বাহা প্রয়োজন অন্নপ্রাশন, বিছারম্ভ, টোলপাঠ উপনয়ন ও বিবাহ প্রভৃতি তাঁহার স্ত্রীধনের ব্যয়ে সমুদয় নির্বাহ এবং পরে চতুষ্পাঠী স্থাপন, বিদেশী ছাত্রগণের স্বায়ীকরণ আহারের বন্দোবস্ত করিয়া স্বর্গারোহণ করিলেন। তাঁহার সপত্নীপুত্র বিছারম্ভ মহাশয় বিমাতার মৃত্যুর পূর্বে কখনও জানিতেন না, যে পরলোকাগতা মাতা তাঁহার সংমা ও "দুহমা" তাঁহার গর্ভধারিণী। জননীর মৃত্যুশোকে পুরোহিত মহাশয় বহুকাল তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ, গয়ায় পিণ্ডদান, মাতৃনামে সরোবর ও কুপ খনন, দেশে সড়ক ও কাশীতে শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করাইলেন।

বর্ষান্তে শ্রাদ্ধ বাসরে পত্নীর চতুষ্পার্শ্ববর্তী গ্রামের সমুদয় লোকজন নিমন্ত্রণ করিয়া বিনি বাহা খাইতে ভালবাসেন, তদনুরূপ ভোজন করাইলেন। সেই সংমাতার নাম এখনও আমাধিগের অঞ্চলে চিরস্মরণীয় হইয়া রাখিয়াছে। "কীর্তিবন্ত স জীবতি"। কালের কঠোরাঘাতে কত কীৰ্ত্তি লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু সেই সাধকী, পতিব্রতা, সর্বভ্যাগী সংমাতার অপূর্ব কাহিনী অতাপি তাঁহাদের বংশ উজ্জল করিয়া রাখিয়াছে।

এই নারীজীবনের আদর্শে আবার কত বিমাতা শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া কত সপত্নী-পুত্রকে নিজ গর্ভজাত পুত্রবৎ স্নেহে পালন করিয়াছেন, তাহার তত্ত্ব আর আমরা কয়জন রাখি ?

সংক্ষেপে ।

আমার মাতামহ বংশের নূতন করিয়া কি আর পরিচয় দিব ? পূর্ব কথার প্রথমে কতক বলিয়াছি, আবার তাহার উল্লেখ না করাই ভাল । বাহারা ‘বাহালীর জমীদার’ পুস্তক পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা “ছাতকের বসন্ত রায়ের” মতীত কাহিনী নিশ্চয় অবগত আছেন । সে বংশের পূর্ব গৌরব এক্ষণে ধূলিসাৎ । খ্রীসম্পদ শ্রাণানভূমির জায় পড়িয়া আছে, সেই লুপ্তপ্রায় কীর্তির কথা স্মরণ করিলে চক্ষে কেবল জল আইসে ও ভগ্ন অট্টালিকার স্তূপাকৃতি ইষ্টক চারিদিকে দেখিলে হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার হয় । কত দেবমন্দির আজ ভূগর্ভে সমাধিপ্রাপ্ত হইয়াছে, সেই রায় বংশের কনিষ্ঠ বাগে আসিয়া বাস করেন, বড় কাশীনাথ রায় স্বনামখ্যাত কাশীনাথ পুরেই রহিয়া যান । এক ভ্রাতার পাঁচজন বংশধর, সেই বাগ গ্রামের জীবনস্বরূপ ছিলেন । ‘বড় হিম্মার’ বড়কর্তার সর্বস্ব বাইয়াও যাহা ছিল, তাহাতে সংসারযাত্রা নির্বাহ অতি সুখেই হইত । পুত্রসন্তান ছিল না, এই বাহা অভাব । তাঁহার একমাত্র কন্যা কাশীন্দ্রী দেবী রূপেণে অদ্বিতীয়া ও পিতার শূন্যগৃহ আলো করিয়া থাকিলেও আত্মীয়-স্বজনের মনের হৃৎক দূর করিতে পারেন নাই । অপুত্রক রায় বংশের বিষয় সম্পত্তি যে কন্যা প্রাপ্ত হইবেন, তাহা তাঁহাদের প্রীতিকর বোধ হইত না । কর্তা গৃহিণীকে পোষ্যপুত্র রাখিবার কথা বলিতে সাহস করিতেন না, নীরবে থাকিতে হইত । কন্যা কাশীন্দ্রী তাঁহাদের মনোভাব বুঝিতেন । রায় মহাশয় ঘরজামাতা রাখিয়া দিলেন, কুলীন কুমার ধনীর গৃহে হঠাৎ নবাবীপদ প্রাপ্ত হইলে যেক্রপ বিকারগ্রস্ত হইয়া থাকে, কোন গৃহজামাতা স্বস্তির অন্ন ধ্বংস করিয়া সে রোগ হইতে মুক্তি পান নাই । কাশীন্দ্রী বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভ্রাতার অভাব ও রায় বংশের নাম লোপের বিষয় ভাবিয়া ভাবিয়া সর্বদা বিষণ্ণ থাকিতেন ও কি উপায়ে পিতার অপুত্রক হৃৎক দূর করিতে পারেন তাহার জন্ত সতত শাস্তি স্বস্ত্যয়ন করাইয়া মাতাকে নানারূপ ব্রত-কথা শুনাইতেন । বিবিধ পূজা, হোম, বাগ যজ্ঞে যখন কোন ফল দৃশিল না, তখন তিনি একদিন সর্বসমক্ষে পিতাকে আবার বিবাহ করিবার প্রস্তাব উত্থাপন করায় তাঁহার জননী কন্যার এই কথায় হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন, তাঁহার পিতার সেকথা কর্ণগোচর হইলে, তিনিও বাড়ীর ভিতর আহালাদি করিতে বাওয়া বন্ধ করিলেন, তথাপি কন্যার হস্ত হইতে নিস্তার পাইলেন না । কাশীন্দ্রী পিতৃ-দেবের চরণে পতিত হইয়া অনেক অল্পনয় বিনয় করিয়া পরে মাতার পদযুগ মস্তকে ধারণ পূর্বক তাঁহার দ্বারাই পিতার মৃত করাইয়া লইলেন । রায়মহাশয়

কন্টার এই নিঃস্বার্থ কার্যের স্বার্থ অর্থ ব্যতিতে পারিয়া নীরবে রহিয়া গেলেন। তাঁহার মনে মনে বিশ্বাস ছিল, শ্রোত্র পাণ্ড সপত্নীসহ গৃহবাস, এমন হলে কোন পিতামাতা তাঁহাকে কন্টা দিবেন না, কিন্তু “কঙ্কিতে বৃদ্ধার বিয়ে” এক রাজ্যেই সম্পন্ন হইয়া গেল। কানীশ্বরীর চেষ্টায় সর্বমূলক্ষণা বয়স্বী এক কুলীন কন্টাকে তুলিয়া আনিয়া সকলে মিলিয়া বিবাহ দিলেন, বড় গৃহিণী অন্তরে অন্তরে অসন্তুষ্ট হইয়াও লোকলজ্জার ভয়ে সপত্নীকে সাধরে বরণ করিয়া লইলেন। নববধূ শ্রামাদিনী ও দরিদ্র পিতার কন্টা হইয়াও কুলেশীলে বড়কজীর সমকক্ষা ছিলেন। কানীশ্বরী পিতৃদেবকে ধরিয়া বিমাতার সর্বদা অলঙ্কারে সুসজ্জিত করিলেন ও নিজ প্রাপ্য আভরণ সকল ছোটমাকে দিয়া স্থানান্তর করিতে লাগিলেন। নিজ-মাতার অজ্ঞাতে পিতার নিকটে বাইয়া বিমাতার পিতামাতার সাংসারিক অভাব দূর করিতে অর্থ চাহিয়া গোপনে তথায় পাঠাইতেন। মাতা কন্টা একবয়সী থাকায় উভয়ের মধ্যে সখীত্বও ছিল এবং বাহাতে পিতৃকুলের পূর্ব-গৌরব রক্ষা হয়, তাহার কারণ তিনি সর্বদা যত্নপরায়ণা থাকিতেন। তাঁহার মাতা কন্টার কার্যকলাপে আশ্চর্য্য হইয়া সকলকে বলিতেন, “কানী কোন দেবকন্টা, শাপে আমার গর্ভে জন্ম লইয়াছে, এখন বাঁচিলে হয়।” কানীশ্বরী স্বীয় জননীর দৈনিক কার্যসকল নিজহস্তে করিতেন, কোনদিকে যেন কোনরূপ ত্রুটি না হয়, তাহা দেখিতেন। বড়কর্তাও বড় পত্নীর প্রতি অতিশয় স্নেহশীল ছিলেন, তাঁহাকে ভয় ও মান্ত করিয়া চলিতেন। তাঁহার বাক্যে সমস্ত সাংসারিক ক্রিয়াকাণ্ড, দেবসেবা, অতিথি অভ্যাগতের সমাদর সমানভাবে পূর্বাপর চলিয়া আসিত। বড় গৃহিণী গৌরাদিনী, ধনীর হুহিতা ও ঘোবনের সহচরী, কন্টার “বুদ্ধত্ব তরুণী ভার্যা প্রাণেভোপি গুরীয়সী” না হইয়া তাঁহার অহুসার উৎসাহময়ী ছিল। তিনি ছোটবধূকে বালিকাবৎ ব্যবহার করিতেন।

বেদিন কানীশ্বরীর প্রথম বৈমাত্রেয় ভ্রাতার জন্ম হইল, সেদিন তিনি হিন্দুর আচার বিচার না মানিয়া একেবারে হুতিকাগছে বাইয়া সন্তানসূত শিশুকে কোলে লইয়া গ্রামহ ও বড়কজীর সমুদয় আত্মীয়স্বজন এবং পিতামাতাকে ডাকিয়া পুরস্কার চাহিলেন, স্নানের রোগ্য গামলা, নাড়ীছেদের স্বর্ণ ‘চৌচ’ ও পরিধানের পট্টিবস্ত্র দাবি করিতে লাগিলেন এবং সে সমস্ত প্রাপ্তমাত্র ধাতী-মাতাকে দিয়া পরিতৃপ্ত হইলেন।

অন্নপ্রাশনের সময় দিব্যকাস্তি স্তম্ভর শিশুর নাম রূপেন্দ্রনারায়ণ রাখিয়াছিলেন। রূপেন্দ্রনারায়ণ বড়মাতার বর্ণশোভা ও দিগ্বির মুখশ্রী পাইয়াছিলেন। ক্রমে হুই পুত্রের জন্ম পরেই বিমাতার বিয়োগে কানীশ্বরী অতীব শোকাকুলা হইয়াছিলেন। বড়মাতাই পরে সপত্নী পুত্রগণকে লালন পালন করিয়া মাহুয করিয়া তুলিয়াছিলেন। তখন কানীশ্বরী দেবীরও হুই পুত্রের জন্ম হয়। চারিজন একজ্রে খেলা-ধুলা ও গৃহ-পাঠশালায় অধ্যয়ন করিতেন। বড় শান্তিতে বধন দিন চলিতেছিল;



সেই সময় উপর হইতে বড়কর্তার ডাক আসিয়া পৌছিল, তিনি গঙ্গাবাত্তার পূর্বে গ্রামস্থ আশ্রমীয় স্বজন ও কস্তাকে ডাকিয়া জমিদারীর দুয়বছার জন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন এবং সমগ্র বিষয়ের চারি অংশ সমানভাগে লেখাপড়া করিতে চাহিলেন। কিন্তু কস্তা কানীশ্বরী দেবী তাহাতে বোর আপত্তি উত্থাপন করিয়া বার আনা দুই ভ্রাতার ও চারি আনা দুই পুত্রের নামে লেখাইলেন। জমিদারী পনর বোল হাজার টাকার, তখনও তাহার উপর গোলাবাড়ী, ক্ষেত খামার, বাগান, পুষ্করিণী, তেজারতী ও জলকর প্রভৃতি লইয়া অনেক সম্পত্তি ছিল। সে সমুদয় ভ্রাতৃগণের নামে দিয়া বাকী চারি আনা পরিমাণ অংশমাত্র পুত্রদ্বয়কে দেওয়াইলেন। আর পিতার লোকান্তর ঘটিলে স্বতন্ত্র গৃহে যাইয়া বাস করিবার জন্ত একখানি পাকাবাটি নির্মাণের অর্থ চাহিলেন। গৃহজামাতা থাকি এদেশে বড় অপমানজনক, কানীশ্বরী পিতৃবিয়োগান্তে নিজগৃহে বাস করিয়া সেই হীনতা হইতে রক্ষা পাইতে পৃথক বাড়ীতে উঠিয়া গিয়াছিলেন। নিজাগরে থাকিয়া নিত্য নিয়মিত ভ্রাতৃগণের হিতার্থ আত্মজীবন উৎসর্গ করিয়া অকাতরে সকলই করিতেন ও ভ্রাতৃগণপ্রাণা ছিলেন। তাঁহার কুলীন স্বামী পত্নীর এই অপূর্ব ত্যাগস্বীকার ও উদারতার মূল্য বুঝিতে পারিতেন না। তাঁহাকে অভ্যস্ত নিন্দোদ্যম মনে করিতেন ও কত প্রকারে বাক্যযন্ত্রণা দিতেন। কানীশ্বরী সে কথার কর্ণপাতও করিতেন না। বয়স্কঃগণের নিকট হাসিয়া গড়াইয়া পড়িতেন ও তাহাতে মনের শান্তি পাইতেন এবং পিতৃবংশ রাখিয়া রায় মহাশয়গণের নাম রক্ষা করিতে ভগবান যে তাঁহাকে সক্ষম করাইয়াছিলেন, সেজন্য তাঁহার চরণে কোটা কোটা কৃতজ্ঞতা জানাইতেন। রায় বংশের সেই ‘বড় হিসার’ বংশধরগণ আজও কানীশ্বরীর কীর্তিস্তম্ভ স্বরূপ বিজ্ঞমান থাকিয়া বাগ গ্রামের সম্মানরক্ষা করিতেছেন। কত বৃগ বৃগান্তর চলিয়া গিয়াছে, তথাপি আমরা সেই আদর্শ জীবনের অলৌকিক অমর কাহিনী অজ্ঞাপি মাতৃমুখে শ্রবণ করিয়া ধন্ত হইয়া থাকি।



## প্রমুখ-পরিচিতি

কবি ও কথাসিদ্ধী প্রসন্নময়ী দেবীর জন্ম প্রাক্তন রাজশাহী জেলার ( পরে পাবনা ) অন্তর্গত হরিপুর চৌধুরী জমিদার বংশে—বাংলা ১৪ আশ্বিন ১২৬৪ ( ইংরেজি ১৮৫৭ অক্টোবর ) তারিখে । প্রসন্নময়ী পিতা দুর্গাধার চৌধুরীর প্রথম কন্যা । তাঁর সাত ভাইয়ের মধ্যে আছেন—হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি ভ্রাতৃ আশুতোষ চৌধুরী, কর্নেল মন্থনাথ চৌধুরী ও বাংলাসাহিত্যে খ্যাতিলাভ সনেটশিল্পী ও ‘সবুজগড়’ সম্পাদক প্রমথ চৌধুরী প্রমুখ কুতূম্ব পুরুষ । কিংবদন্তি অনুসারে প্রসন্নময়ীর মাতামহ বংশ, বাগকানীনাথপুরের রায়েরা, বাংলার বার-ভূঁইঞার অন্ততম এবং বংশমর্যাদায় তাঁরা বারোই সমাবে বিশেষ খ্যাতিমান ছিলেন । পিতামহীর সহোদরা ছিলেন নাটোরের মহারানী কৃষ্ণমণি । তাঁর অত্যন্ত স্নেহের পাত্রী প্রসন্নময়ীর বালাজীবন ছিল আনন্দময় । সেকালে স্ত্রী-শিক্ষার তেমন প্রচলন না থাকলেও হরিপুরের চৌধুরী বংশের কর্তারা পরিবারের মেয়েদের প্রয়োজনীয় প্রাথমিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করেন নি । এমন কি প্রসন্নময়ীর পিসিমারা গৃহ-শিক্ষকের কাছে রীতিমতো বিজ্ঞাত্যাস করেছিলেন এবং প্রসন্নময়ী ও আশুতোষের লেখাপড়ার দায়িত্ব নিয়েছিলেন তাঁদের পিতা স্বয়ং ।

অতঃপর বংশগত প্রথা অনুসারে মাত্র ১০ বছর বয়সে প্রসন্নময়ীর বিবাহ হয় পাবনার গুণাইগাছা গ্রামনিবাসী মুখ্যকুলীন কৃষ্ণকুমার বাগচীর সঙ্গে । কিন্তু বিবাহের মাত্র দুই বৎসর পরে স্বামী উন্মাদ রোগগ্রস্ত হওয়ার প্রসন্নময়ী পিতৃগৃহে এসে বাস করতে থাকেন । এইভাবে অল্প বয়সেই তাঁর বিবাহিত জীবন ব্যর্থ হওয়ার স্নেহশীল পিতা স্বয়ং কস্তার বাংলা ও সংস্কৃত শিক্ষার দায়িত্ব নেন এবং ইংরেজি শিক্ষা ও গান বাজনা শিক্ষার ভার দেন এক বিদেশিনী শিক্ষিকার হাতে । ক্রমশ তিনি বাংলা গল্প-পদ্ম রচনার আকৃষ্ট হন এবং আধ্যাত্মিক, ভাবতরঙ্গ, মাতৃমন্দির, মানসী ও মর্ম্মবাণী ইত্যাদি পত্রিকায় লিখতে শুরু করেন । মাত্র ১২-১৩ বছর বয়সে তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘আখ-আখ-ভাবিনী’ ( ১২৭৬ সাল/১৮৭০ খ্রি. ) প্রকাশিত হয় । এই প্রথম কাব্য ও তৃতীয় কাব্য ‘বনলতা’ ( ১২৮৭/১৮৮০ খ্রি. ) বই দু’খানি তাঁর পিতার নামে উৎসর্গীকৃত । অতঃপর তাঁর পূর্বসৃষ্টি, বনলতা, নীহারিকা ( ২ খণ্ড ), আধ্যাত্মিক, অশোকা ইত্যাদি গল্প ও কবিতার বই প্রচারিত হয় এবং পাঠকসমাজে যথোচিত সমাদৃত হয় । প্রসন্নময়ীর গল্প ও কবিতার বিশেষত্ব হল একটি সরল মায়ুষ্পূর্ণ ভক্তি ও আদর্শ । তাঁর গল্প রচনার ভাষা বাংলা সাহিত্যে একটি বিশেষ ধারার প্রতিনিধিত্ব করেছিল । কবি প্রসন্নময়ী বিচিত্র বিষয়ে ঋণকাব্য রচনা করেছিলেন । অদৃষ্টের অমোঘ বিধানে তিনি জীবনের প্রথম পর্বেই হৃৎকণ্ঠের বে নির্ভয় আঘাত পেয়েছিলেন, সেকথা

তার কাব্যের মধ্যে নানাতাবে প্রতিকলিত হয়েছে। প্রসন্নময়ীর বেদনাময় জীবনের অবসান ঘটে সুদীর্ঘ ৮২ বছর বয়সে—২৫ নভেম্বর ১৯৩৯ সালে। তাঁর একমাত্র কন্যা প্রিয়দা দেবীও ( ১৮৭১-১৯৩৫ ) বাংলা সাহিত্যে জনপ্রিয় লেখিকা হিসেবে সুপরিচিত।

সুদীর্ঘ ৮২ বছরের জীবনে প্রসন্নময়ীর মুদ্রিত বইপত্রের সংখ্যা মাত্র ৯ খানি—কাব্য ৪ খানি ও গল্প ৫ খানি। আর গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত কিন্তু সাময়িক পত্রে প্রকাশিত কিছু গল্প-পত্র রচনা। অপ্রকাশিত রচনাবলির মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য রচনা হল—আন্তোয় চৌধুরীর জীবনকথা, ‘মাতৃমন্দির’ পত্রিকায় মুদ্রিত। প্রকাশকাল অনুসারে তাঁর মুদ্রিত বইগুলির নাম যথাক্রমে—১. আখ-আখ-ভাবিলী ( কাব্য, ১২৭৬ সাল/১৮৭০ খ্রী. ), ২. পূর্বস্মৃতি ( গল্প, ১২৮২/১৮৭৫ ), ৩. সুবরাজ প্রিন্স অব ওয়েলসের ভারতবর্ষে গুভাগমন ( কাব্য, ১২৮২/১৮৭৫ ), ৪. বনলতা ( কাব্য, ১২৮৭/১৮৮০ ), ৫. নীহারিকা ( কাব্য, ১ম ভাগ ১৮৮৪/২য় ভাগ ১৮৯৬ ), ৬. আখ্যাবর্ত ( ভ্রমণকথা, ১২৯৫/১৮৮৯ ), ৭. অশোকা ( উপন্যাস, ১২৯৬/১৮৯০ ), ৮. তারা-চরিত ( গল্প, ১৩২৪/১৯১৭ ), ৯. পূর্ব কথা ( আত্মজীবনী ১৩২৪/১৯১৭ )।

প্রসন্নময়ীর রচনাবলির কয়েকটি বিশিষ্ট দিক হল—শতবর্ষ পূর্বের সমাজচিত্র ও সামাজিক কুসংস্কারের প্রতিবাদ, নারীজাতির কল্যাণচিন্তা, প্রকৃতিচেতনা ও প্রকৃতিপ্রেম এবং স্বদেশপ্রীতি ইত্যাদি। সেই সঙ্গে আছে তাঁর বেদনাবিদ্ধ জীবনের প্রশান্ত ভাববৃত্ত সরল ও সহজ ভাষা, অনাড়ম্বর শব্দসম্পদ আর মার্জিত প্রকাশভঙ্গি। মনীষী রাজনারায়ণ বসু ছিলেন তাঁর অগতম এক গুণমুগ্ধ পাঠক—প্রসন্নময়ীকে মুগ্ধ স্বীকৃতি দিয়েছেন ‘মা’ বলে। সমকালীন ক্যালকাটা রিভিউ, ইণ্ডিয়ান মিরর, ইণ্ডিয়ান নেশান ইত্যাদি পত্র-পত্রিকায় প্রসন্নময়ীর রচনাগুলোর আন্তরিক স্বীকৃতি প্রচারিত হয়েছে স্বতঃস্ফূর্তভাবে। তাঁর ‘বনলতা’ কাব্যের সমালোচনা প্রসঙ্গে সেদিন ক্যালকাটা রিভিউ পত্রে বলা হয়েছিল প্রসন্নময়ীর কাব্য যেন বিগতদিনের জাতি-বুধী-মল্লিকা ও মালতীর স্নেহ ও মনোরম সুরে নিবদ্ধ (“...poems on a variety of subjects which bear the impress of a mind emancipated from the thralldom of Jati, Juthi, Mallika, Malati of bygone ages, and awakening to an appreciative perception of the beautiful, the grand and the sublime not simply in *terrestrial* objects, but likewise in the phenomenal aspects of Nature, in all her immensity.”) প্রসন্নময়ীর সমগ্র রচনাবলির মূলমন্ত্র সম্পর্কেও একথা সমান প্রযোজ্য।

প্রসন্নময়ীর জীবিতকালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত সর্বশেষ রচনা আমাদের আলোচ্য ‘পূর্ব কথা’ প্রথম প্রচারিত হয় বাংলা ১৩২৪ সালে ( ১৯১৭ খ্রী. )।

এছাকাশে প্রকাশের পূর্বে রচনাটি কুমুদিনী মিত্র সম্পাদিত 'সুপ্রভাত' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে মুদ্রিত হয় - ১৩১২ আশ্বিন থেকে ১৩২০ কার্তিক পর্যন্ত মোট ১৪টি সংখ্যায়। অতঃপর এছপ্রকাশকালে 'পূর্ব কথা'র সঙ্গে একটি 'পরিশিষ্ট' বৃদ্ধ হয়। প্রকাশকালে লেখিকার বয়স ৬০ এবং বইখানি তাঁর মায়ের নামে উৎসর্গীকৃত। এই উৎসর্গপত্রের মধ্যেও বইখানির নামকরণের একটা 'জীবন্ত' যোগাযোগ আছে। উৎসর্গপত্র, যথা : "মা, তুমিই জীবন্ত 'পূর্ব কথা', তবুও আমার আমি তাহা কাগজ কালি কলমে লিখিয়া তোমার শ্রীচরণে উৎসর্গ করিয়া প্রম সার্থক জ্ঞান করিলাম। প্রণত কন্যা প্রসন্নময়ী। 'তারাবাস' ২রা জ্যৈষ্ঠয়ারী, ১২১৭।"

আলোচ্য 'পূর্ব কথা' প্রথম সংস্করণের আখ্যাপত্রাদির পরিচয় : "পূর্ব কথা। শ্রীপ্রসন্নময়ী দেবী। কলিকাতা, ৫৫নং আগার চিংপুর রোড, শ্রীরূপগোপাল চক্রবর্তী দ্বারা মুদ্রিত। ১৩২৪ সাল। মূল্য ৥০ আনা। প্রকাশক শ্রীবরেন্দ্রনাথ ঘোষ। বরেন্দ্র লাইব্রেরী, ২০৪ নং কর্নওয়ালিস স্ট্রীট। কলিকাতা।" (আখ্যাপত্র, উৎসর্গ ইত্যাদি [৩], ১৮৭ পৃ.; কাগজের মলাট)।

লেখিকার পারিবারিক ও আত্মচরিতকথামূলক রচনা হলেও বইখানি সমকালীন সামাজিক চিত্রের উপভোগ্য একখানি বিশিষ্ট দলিল স্বরূপ। প্রথম প্রকাশের সুদীর্ঘ ৬২ বছর পরে 'এক্সন' ১৩৮৬ শারদীয় সংখ্যায় পুনর্মুদ্রণের এবং বর্তমানে এছাকাশে পুনঃপ্রকাশের এটাই বোধ করি অন্তিম কারণ ও সার্থকতা। কিন্তু সমকালীন পত্র-পত্রিকায় এই বইখানি তেমন গুরুত্ব-সহকারে যথোচিত আলোচিত হয় নি। সেদিনের বাংলার জনপ্রিয় সাময়িকপত্র 'প্রবাসী'তে (১৩২৪ চৈত্র/পৃ. ৬০৪) প্রকাশিত মাত্র দু'লাইনের একটি বিজ্ঞপ্তি একবার বড় প্রমাণ : "পূর্ব কথা। শ্রীপ্রসন্নময়ী দেবী। দাম ৥০ আনা। প্রকাশক শ্রীবরেন্দ্রনাথ ঘোষ, ২০৪নং কর্নওয়ালিস স্ট্রীট। সেকালের সামাজিক চিত্রের সরস বই।"

যদিও সেকালের রচনানির্বিশেষে সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাসের উপকরণ হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়, তবু আত্মকথার বর্ণনা প্রসঙ্গে শতাধিক বর্ষ পূর্বের বাংলার সামাজিক অবস্থার পরিচয়মূলক রচনাগুলি এবং বিশেষত আলোচ্য 'পূর্ব কথা'র রচনাটি একালের সমাজ-সচেতন পাঠকের কাছেও সমান উপভোগ্য। তাই, মূলত কবির পারিবারিক ও আত্মচরিতকথামূলক রচনা হলেও বইখানি একাধারে সেকালের সামাজিক তথ্যসমৃদ্ধ এক অসাধারণ রচনা, একথা অনস্বীকার্য। এছাড়া, যে বিশিষ্ট অন্তরঙ্গ স্বাদ ও ভজিবৃত্ত গদ্য-পদ্য রচনার দ্বারা প্রসন্নময়ী বাংলা সাহিত্যের সেবা ক'রে গেছেন, তারই প্রসন্ন স্বাক্ষর রয়েছে 'আলোচ্য 'পূর্ব কথা'র সর্বাদে।

রচনাটির শুরুতেই লেখিকার সেই স্বভাবসিদ্ধ আন্তরিক হৃদয় যেন আপনমনে বেজে উঠেছে তানপুরার ধুরার মতো : "জননী জগদ্বিশিষ্ট স্বর্গাদপি গরীয়সী।

আমাদের গ্রামের আদি নাম কি তাহা জানি না ও এক্ষণে জানিবারও কোন উপায় নাই। স্বেচ্ছায়ী মাতৃকসিদ্ধি পিতৃকসাগণ এখন লোকান্তরে, কুলপুরোহিত চক্রবর্তী মহাশয়দিগেরও বংশলোপ হইয়াছে। নিবরাজির সলিতার মত যে ছ'একজন আছেন, তাঁহারা ইংরেজীনবিশ, স্ত্রুতাং অতীতকথা অতীত, স্মৃতির সহারে বাহা মনের মধ্যে তোলপাড় করে তাহাই লিখিতেছি। আমার পূর্বপুরুষ শাক্ত, পূজা হোম বলি তাঁহাদের নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার ছিল। হরি মৈত্র ও মৈত্রের পুত্র বাদবানন্দ চৌধুরী [ 'বাছুকীর্তনে' ] চৈতন্যদেবের ধর্ম সঙ্কীর্তনে মুগ্ধ হইয়া হঠাৎ তাঁহাদের শিক্ত্যগ্রহণ পূর্বক গ্রামের নাম 'হরিপুর' রাখিয়াছিলেন। আমার পিতৃগৃহ এখনও সেই স্মৃতিময় হরিপুরেই। তাহার পূর্বের সব ভদ্রাবশেষ এবুগেও আমাদের নিকট তেমন মর্ম্মস্পর্শী ও সুখপ্রদ।" (পৃ. ১)

অতএব সেই মর্ম্মস্পর্শী ও সুখপ্রদ স্মৃতি তোলপাড়-করা কবির পরিজন ও পরিবেশকথা স্বভাবতই আবেগময় নটালজিয়ার আমেজে মনোহারী। এবং রচনার মধ্যে দেশকাল ও সমাজের যে অন্তরঙ্গ চিত্র ফুটে উঠেছে তা যেমন উপভোগ্য তেমনই তুলনাহীন। যদিও রচনার মধ্যে কোথাও কোথাও প্রতি-স্মৃতির দৃশ্য দেখা দিয়েছে, তবু তা সামগ্রিক ব্যাপ্তির তুলনায় উপেক্ষীয়। যেমন, সিপাহি বিদ্রোহের বছরে (১৮৫৭ খ্রি.) তাঁর জন্ম, এবং তখন তিনি কোলের শিশুমাত্র হলেও স্মৃতিভারে বিভ্রান্ত লেখিকা শিশুহুলত নির্দোষ ভঙ্গিতে লিখেছেন : "সিপাহি বিপ্লবের সময় আমি যে ঠিক কত বড় তাহা জানি না। তবে ছাত্রত্ব বিদ্রোহীগণ বৎকালে উদ্ভবৎ চতুর্দিকে দৌরাড্রা করিয়া বেড়াইতেছে, জনসাধারণ তাহাদের ভয়ে গৃহের বাহির হইতে পারে না, সেই দুর্দিনে আমরা নৌকাযোগে মাতামহালয় [ পাবনা ] বহিতে পিত্রালয় হরিপুর কিরিবার পথে শুনিলাম সিপাহীরা সব আরোহীর নৌকা আক্রমণ করিয়া বাহা কিছু পাইতেছে তাহাই লুণ্ঠ করিতেছে।" (পৃ. ২৮)

এই সামান্ত ক্রটি-বিচ্যুতির কথা বাদ দিলে 'পূর্ব কথা'র আমরা বা পাই তা যেন স্মৃতিমান স্মৃতিকথার অমূল্য রত্নভাণ্ডার। গ্রন্থরচনার বংশ পরিচয়ের পরই কুলীন সমাজ ও লৌকিকতার দোষগুণ থেকে শুরু করে পরিশেষে সংসা-মেয়ের কথা পর্যন্ত কত বিচিত্র কাহিনী লেখিকা আমাদের যে শুনিয়াছেন তা যেন আর ফুরায় না। তাঁর অসুস্থ স্মৃতির ঝাঁপি থেকে লেখিকা আমাদের উপহার দিয়াছেন একে একে সেকালের ইতিহাসমণ্ডিত কত বিচিত্র কথা : সামাজিক ও লৌকিক দোষগুণ, সেকালীন কলকাতা ও নৈহাটি বাতারাভের সুবিধা-অসুবিধা, বিদ্যালয়পাঠ্য পুস্তকের নামধাম, বাল্যবিবাহ ও বিধবাবিবাহ, ইংরেজি ও মুসলমানী আবদকারদা, পলাশির যুদ্ধ ও পরাধীনতা, ঠগীর হাঙ্গামা ও গাংছা-মোড়ার অত্যাচার, ককিরচাঁদ রায়ের সময়ে বাংলার প্রাচুর্য, সিপাহি বিদ্রোহ ও অত্যাচার, গঙ্গাবাদা ও গঙ্গাধর কবিরাজের দূরদর্শিতা, লাতিয়াল ডাকাতের ভক্তি

ও ভ্রাম্যবিবরক গীতচর্চা, কৃষ্ণনগর-বনগ্রাম-মুর্শিদাবাদ-রাঙ্গশাহীর পরিবেশ, শৈশবের ব্রতকথা ও খেলাধুলা, নষ্টচন্দ্র ও বাজাগান, গোবিন্দ-মধুকান-লোকায়োপা গ্রন্থখ বাজাওয়ার পরিচয়, জালেশ্বরের হাফাযা, বিবাহ ও বেদনাময় দাম্পত্য জীবন, বশোহর ও হরিপুরের ছুঁতক ও মহাযাত্রী, সাহিত্যোৎসব-বন্ধুগণের আসরে বোগদান, ঈশ্বর ও শ্রমের বংশধর জনৈক বৈভবায় ও সংকুত শিককের বিজ্ঞাবজ্ঞা, পিতার গৃহশিক্ষকতা, দীনবন্ধু মিত্রের বিশেষ অভিনয়ে অংশগ্রহণ, বালাবিধবার একাদশী পালন, কলির ভীম কালীকান্ত চৌধুরীর পরিচয়, মোবীর শান্তির দাবিতে গ্রামবাঙ্গীর ধর্মবট, 'একঘরে' ব্যক্তির জুগুতি ও আদালতের আশ্রয় ভিক্ষা, মহাত্মা চামতল্লাহ লাহিড়ীর পরিচয়, ইলবার্ট বিলের প্রতিবাদে দেশবাসী আন্দোলন, বালিকাবন্ধু লেখাপড়া ও চিত্রবিজ্ঞা শিক্ষা, শেলি-বায়রন-ওয়ার্ডসওয়ার্থ পাঠ, বিজ্ঞানাগর-বন্ধিমচন্দ্র-সঞ্জীবচন্দ্রের গ্রন্থাবলি পাঠ, স্বরচিত প্রথম কাব্যগ্রন্থ, কালোচিত্র জীশিকা ও মানমর্ষাদা, অক্ষরচন্দ্র সরকারের 'সাধারণী' পক্ষে বোগদান, বঙ্গদর্শনের আবির্ভাব ও বন্ধিমচন্দ্রের জ্ঞানগর্ভ সমালোচনা, নাট্যাচার্য অর্ধেন্দুপেথের সুতকির পরিচয়, উপেন্দ্রনাথ দাসের 'শরৎ সরোজিনী' নাটক, শিল্প-সাহিত্য ও সংগীতের চর্চায় পিতার উৎসাহদান, কৃষ্ণনগরের বসন্তবেলা, নবগোপাল মিত্রের স্বদেশীদল, পাটনার প্রসন্ন সিংহের আর্ভসেবা, মজঃকরপুরের কেদারবাবুর বদান্যতা, শ্রীর অ্যাশলি ইডেনের অভিধানমূলক সাক্ষ্য সমিতি, জীবিতের কামাখ্যা অর্জুনা, আওতোব চৌধুরীর ইংল্যান্ড গমন উপলক্ষে একঘরে হওয়া ও প্রায়শ্চিত্ত, আওতোবের সঙ্গে জাহাজে রবীন্দ্রনাথের পরিচয়, ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক, লেখিকার জন্মদিনে 'পূর্ব কথা' সমাপ্তি উপলক্ষে কাব্যরচনা ইত্যাদি; অতঃপর 'পরিশিষ্ট' অধ্যায়ে আছে দেবদেবীর বাহ্যাত্মক কাব্য ও রামায়ণ-মহাভারত পাঠ, গ্রাম্য রমণীদের লেখাপড়া, লৌকিক কাব্য-উপন্যাস ইত্যাদি পাঠ, ষাঁটি দুধ-বি-ছানার কথা, গৃহস্থ বাড়িতে জীতদাস-দাসী নিয়োগ, দাস-মহাত্মা ও ব্রতপালন, বাজাওয়ালা ও বাস্তব-কীর্তনীবাঈ-তাড়-বাজিকর পরিচয়, পিয়ানো-শিক্ষা রহস্য, হেমচন্দ্র-মধুসূদন পাঠ এবং সংসা ও মেয়ের বিচিত্র কথা ইত্যাদি।

এই সমস্ত টুকরো স্থতির বিচিত্র কাহিনী এখনো আমাদের মনকে দোলা দেয়, বিশেষত কতকগুলি ঘটনা তো আজও রীতিমতো কোঁতুলোজীপক। বখা : রাঙ্গশাহী-কলিকাতা যাত্রায় (পৃ. ৬), বাংলা পাঠাপ্তক (পৃ. ৭), গায়ছা ঘোড়ার দল (পৃ. ৯), ককিরচাঁদ রায়ের সময়কার প্রাচুর্য (পৃ. ১০), গঙ্গা লাভার্থে মুর্শিদাবাদ গমন (পৃ. ১৬), জী একঝোড়া চটি জুতা (পৃ. ১৮), লাঠিঘাল ডাকাতির ভক্তি ও ভ্রাম্যবিবরক গীতচর্চা (পৃ. ১৮-১৯), ধনীর পুত্রদের লাঠিখেলা ও সড়কী-বন্দুক চালনা (পৃ. ২০), শুভ সংবাদ বহন ও পুরস্কার লাভ

( পৃ. ২২ ), গহনা পরা ও সাজসজ্জা ( পৃ. ২২-২৩ ), নষ্টচক্রে অহুষ্ঠান ( পৃ. ২৫ ), পুন্নারীগণের কালী প্রতিমা দর্শন ( পৃ. ২৬ ), সখবার মুহূর্ত ( পৃ. ৩১ ), সাহিত্যাহুয়াগী বন্ধুগণের আসর ( পৃ. ৪২ ), মহিলাদিগের মুখের উপর সূখ্যাতি করা ( পৃ. ৪৩ ), ম্যালেরিয়া জ্বরে ঔষধপত্র ( পৃ. ৫১-৫২ ), মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের রাজধানী কৃষ্ণনগর ( পৃ. ৫৮ ), গ্রন্থকারগণের প্রতি কমলার কৃপাদৃষ্টিপাত ( পৃ. ৬০ ), সেকালে বিলাত যাত্রা ও প্রায়শ্চিত্ত ( পৃ. ৬৯ ), গ্রাম্য রমণীদের লেখাপড়া ( পৃ. ৮১ ), হাতে খড়ি ও গ্রাম্য রূপকথা প্রবণ ( পৃ. ৮১-৮২ ), সেকালের খাঁটি দ্বি-দুখের দাম ( পৃ. ৮২ ), গৃহস্থের ঘরে ক্রীতদাস-দাসী নিরোগ ( পৃ. ৮৩ ) ইত্যাদি । বলতে গেলে বইখানির আগাগোড়াই এরকম বিচিত্র ঘটনার ঠাসা, এগুলি তার উপভোগ্য নমুনা যাত্র ।



